পদার্থবিদ্যা

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম খণ্ড



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান প্রবেশ

পদার্থ ও শক্তি ● শব্দ

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে

PADARTHA O SHAKTI ● SHABDA
by Charu Chandra Bhattacharya

প্রথম পর্ষদ সংস্করণ
প্রকাশকাল—মার্চ ১৯৮০

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আর্য ম্যানসন (নবমতল)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

চিত্রাংকন : এস্ মিত্র
প্রচ্ছদ : বিমল দাস

মুদ্রক :
শ্রীপ্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়
টাইপোগ্রাফার্স অফ ইণ্ডিয়া
৩৬ এ, কে. জি. বোস সরণী
কলিকাতা—৭০০০১০

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Fxecutive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

পর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য লোকরঞ্জন বিজ্ঞান-পুস্তিকামালার অন্তর্গত সুখপাঠ্য নিবন্ধিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পুনর্মুদ্রণে অগ্রণী হয়েছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেসব দুষ্প্রাপ্য অথচ ছাত্র ও শিক্ষার্থীর উপযোগী পুস্তকাদি রয়েছে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ-প্রকল্পের অন্তর্গত এই কার্যসূচী। প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন মিত্রের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলেই এই কার্যসূচীর বাস্তবায়ণ সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃপক্ষ পর্ষদকে প্রকাশনার অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সকল পড়ুয়া শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন আমাদের এই মুদ্রণপ্রয়াস যদি পাঠক-সমাজের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হয়, তবেই এজাতীয় ভবিষ্যত কর্মদ্যোগে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ উৎসাহ বোধ করবেন। আশা রাখি সুধী পাঠক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এই গ্রন্থমালার পুনঃ প্রকাশনা উদ্যমকে স্বাগত জানাবেন।

কলিকাতা
মার্চ, ১৯৮০

দিব্যেন্দু হোতা
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

পদার্থ ও শক্তি

চিত্রসূচী

পদার্থ ও শক্তি

শব্দ

পরিষদের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল ভারতীয়দের হাতে। সারা বিশ্বে ঘোষিত হল ভারতের স্বাধীনতার কথা। ভারতের মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল কর্মের উন্মাদনা। এই উন্মাদনাকে সঠিকপথে চালিত করতে হলে, ভারতের সীমিত সম্পদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা। আবার পরিকল্পনাগুলিকে যথোচিত বাস্তবায়িত করতে হলে চাই গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা বিজ্ঞান সচেতনতাই মানুষকে করে তোলে যুক্তিবাদী, অন্ধসংস্কার বিরোধী। সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে শুধু এই কথাগুলি অনুধাবন করেননি, তাঁর দূরদৃষ্টি চিন্তাধারাকে রূপায়িত করার জন্যে তরুণ ও প্রবীন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানীনুরাগীদের নিয়ে স্থাপিত করেন **বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ** ১৯৪৮ সালে। এই বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সহজ সরলভাবে বিজ্ঞানের কথাগুলিকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানালেন মাতৃভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করতে। তাঁর আহ্বানের ফসল এই পুস্তিকা। আচার্য বসু তাঁর জীবিতকালে পরিষদের তত্বাবধানে এই পুস্তকটি প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় ও অর্থাভাবে বহুদিন পরিষদের জনপ্রিয় পুস্তকগুলি অপ্রকাশিত থাকে। এই সংকটকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করছে বলে আমরা মনে করি। আশা করব পরিষদ ও পর্ষদের উদ্দেশ্য পুস্তকগুলি বহুল প্রচারের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

ডঃ রতনমোহন খাঁ

কর্মসচিব,

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

বিষয়সূচী

পদার্থ ও শক্তি

শব্দ

পদার্থ ও শক্তি

পদার্থ

ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা বাইরের পরিচয় পাই। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে শুঁকি, জিব দিয়ে আস্বাদ নিই, আর সমস্ত দেহ দিয়ে স্পর্শ অনুভব করি। এই সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে যা-কিছুর পরিচয় পাই সবই কি পদার্থ ?

প্রচণ্ড গরম, বাতাস স্তব্ধ, গাছের পাতাটি অবধি নড়ছে না, হঠাৎ পশ্চিম আকাশে একখানা কালো মেঘ দেখা দিল, তারপর—

'হুড়্-হুড় দুড়্-দুড় মেঘ ডাকিছে'
'চিক্‌মিক বিদ্যুতের আলো জ্বলিছে'
'টুপ্‌টাপ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িছে'
'শান্ত ছেলে ঘরে বসে শিল ধরিছে'।

এখানে প্রচণ্ড গরম, স্তব্ধ বাতাস, মেঘের ডাক, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, শিলা—এরা সবই কি পদার্থ ? প্রচণ্ড গরম, মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হলেও ওদের পদার্থ বলা হয় না, কিন্তু বৃষ্টি ও শিলাকে পদার্থ বলি। আর স্তব্ধ বাতাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর না হলেও ওকে পদার্থ বলে ধরা হয়। মোটামুটি ঠিক করা হয়েছে, যা-কিছুর ওজন আছে তা পদার্থ। মেঘের ডাক, বিদ্যুতের আলো, প্রচণ্ড গরম এ-সব আমরা অনুভব করি বটে, কিন্তু এদের ওজন নেই, কাজে কাজেই এরা পদার্থ নয়। বায়ু অদৃশ্য হলেও বায়ুর ওজন আছে, সুতরাং বায়ু পদার্থ।

পদার্থের বিভিন্ন রূপ

বৃষ্টি, শিলা, বায়ু ছাড়া আমাদের সামনে কত পদার্থ দেখছি,—কাঠ, পাথর, লোহা, তেল, আরও কত কি! এদের মধ্যে কাঠ, পাথর, লোহাকে আমরা কঠিন পদার্থ বলি, তেল জলকে তরল পদার্থ, আর বায়ুকে

গ্যাসীয় পদার্থ বলি। কিন্তু কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে তফাৎটা হল কোথায় ?

কঠিন পদার্থের নিজস্ব একটা আকার আছে,—গোল, চৌকা, চেপ্‌টা, এই রকম সব। কিন্তু তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের নিজস্ব কোন আকার নেই, যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রের আকার নিয়ে নেয়। আবার, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যেও একটা প্রভেদ আছে। একটা ঘটিতে এক সের জল ধরে ; এই ঘটিতে যদি এক পোয়া জল রাখা যায়, তবে ঘটির মাত্র সিকি-ভাগে ওই জল থাকবে, বাকিটা খালি রয়ে যাবে। যদি আধ সের জল ঢালা যায়, তবে ঘটির অর্ধেকটা জলে ভরতি হবে, বাকিটা খালি থাকবে। কিন্তু কোন পাত্রে একটুকু মাত্র বায়ু বা অন্য কোন গ্যাস ছেড়ে দিলে, সেই গ্যাস সমস্ত পাত্রটাকে ভরে ফেলবে। মনে করা যাক, ঘরের মধ্যে এক জায়গায় কোন দুর্গন্ধ গ্যাস ছাড়া হল। সেই দুর্গন্ধ তো ঘরের সব জায়গা থেকে পাওয়া যাবে। এ থেকে জানা যায়, গ্যাসটি ঘরময় ছড়িয়ে গিয়েছে।

ঠাণ্ডায় বা গরমে একই পদার্থ কঠিন, তরল বা গ্যাসের আকার ধারণ করে। এ-কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

পদার্থ অবিনশ্বর

পদার্থ সম্বন্ধে একটা বড় কথা হল এই যে, আমরা পদার্থ সৃষ্টি করতে পারি না, আবার পদার্থের ধ্বংসও নেই। সে কি! ওই যে মোমবাতি জলছে, সে তো পুড়ে শেষ হয়ে গেল, পদার্থের নাশ তো চোখের উপর দেখছি! আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয়। বাতি যখন জলছে তখন বাতির মোমের সঙ্গে বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন বলে যে গ্যাস আছে সেই অক্সিজেনের মিলন হচ্ছে, মিলনের ফলে জন্মাচ্ছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বলে একটা গ্যাস,—সেও দেখা যায় না, আর খুব অল্প পরিমাণে একটু জল, তাও অদৃশ্য বাষ্পের আকারে। এখন একটা পরীক্ষা করা হল। বাতির যে অংশ পুড়ে অদৃশ্য হল, আর যতটা অক্সিজেনের সঙ্গে তা মিলল, এই দু-এর ওজন বের করা হল। অন্যদিকে জলবার ফলে যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস জন্মাল, আর যে পরিমাণ জল হল এ দু-এরও ওজন ঠিক করা হল। দেখা গেল, দুদিকের ওজন হুবহু এক।

অনেক রকম পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী দেখল, পদার্থের হ্রাসও নেই, বৃদ্ধিও নেই ; সে শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপ নিচ্ছে।

শক্তি

আর একটা কথা আছে। প্রচণ্ড গরম অনুভব করলুম, বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলুম, মেঘগর্জন শুনলুম,—এরা পদার্থ নয় বুঝলুম। কিন্তু এরা কি ? এরা শক্তির এক এক রূপ। শক্তি নানা রকম ভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে !

পৃথিবী আর গ্রহরা প্রচণ্ড-বেগে ঘুরছে, একটা ধুমকেতু তার বিরাট পুচ্ছ নিয়ে এসে পৃথিবীর কাছ দিয়ে চলে গেল। এঞ্জিনের ভিতরের তাপের শক্তি প্রকাণ্ড একখানা ট্রেনকে মিনিটে এক মাইল বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। বিদ্যুতের শক্তি আলো জ্বালাচ্ছে, পাখা ঘোরাচ্ছে, ট্রাম চালাচ্ছে। চুম্বকের শক্তির, আলোর শক্তির কাজও আমরা দেখি। রাসায়নিক ক্রিয়া থেকে যে শক্তি পাওয়া যাচ্ছে তা কামান ছুঁড়ছে, এরোপ্লেন চালাচ্ছে। আমাদের চারদিকে শক্তির এরূপ নানারকম কাজ চলেছে।

পদার্থ সম্বন্ধে যেকথা বলা হয়েছিল, শক্তি সম্বন্ধেও সেকথা খাটে,—শক্তিরও হ্রাস নেই, বৃদ্ধিও নেই ; এরও সৃষ্টি নেই বিকাশ নেই, শুধু একরূপ থেকে অন্য রূপ নিচ্ছে। একখানা ইট উপরে তুললুম, এর জন্য আমি শক্তি খরচ করলুম, কিন্তু সে শক্তি কি লোপ পেয়ে গেল ! মোটেই নয় ! সে শক্তি তোলা রইল। ওই ইট উপর থেকে যখন পড়বে, তখন সে কাজ করবে। যদি কারও মাথার উপর পড়ে, তার মাথা ভাঙবে।

পদার্থের হ্রাস নেই বৃদ্ধি নেই, এ-কথা শুনলুম। শক্তিরও সৃষ্টি নেই বিনাশ নেই, একথাও জানলুম। কিন্তু এখনকার দিনে বিজ্ঞানের একটা বড় কথা হল এই যে, পদার্থকে শক্তির রূপে নিয়ে যাওয়া যায়। বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এ কথা বললেন। আর শুধু বলা নয়, তিনি আঁক কষে দেখিয়ে দিলেন, কতটুকু পরিমাণ পদার্থ রূপান্তরিত হলে কি পরিমাণ শক্তি বেরবে। প্রচণ্ড এই শক্তির পরিমাণ। আমরা তাপের শক্তি, তড়িতের শক্তি, ব্রহ্মাণ্ডে ছোট বড় সব

পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ-শক্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি, কিন্তু কোথায় লাগে ওই সব শক্তি পদার্থের রূপান্তরে-পাওয়া শক্তির কাছে! আমার হাতের মুঠোর মধ্যে যেটুকু বায়ু রয়েছে, তা শক্তির রূপ নিলে ওই পাহাড়টাকে এক নিমেষে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই, বিজ্ঞান কি শক্তিকে মুক্ত করতে পেরেছে?

শেষ অবধি তা পারল বৈকি! এক রকমের পদার্থকে শক্তির রূপে নিয়ে যাবার উপায় বিজ্ঞানী বের করল। একটি ডিমের আকারের সেই পদার্থের কিছু অংশ শক্তির রূপ নিল। যে প্রচণ্ড শক্তি তার থেকে বেরল, মুহূর্তমধ্যে তা একটা প্রকাণ্ড শহরকে ধ্বংস করল। গত যুদ্ধের সময় এই রকমের ঘটনা বিজ্ঞানী ঘটাল।

সূর্যের প্রচণ্ড তাপ কোথা থেকে আসছে? বিজ্ঞানী এতদিনে তার একটা হদিস পেল। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সেখানকার হাইড্রোজেন বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিলিয়মের রূপ নিচ্ছে। এই পরিবর্তনে পদার্থের রূপান্তর ঘটছে, আর তা শক্তির আকারে দেখা দিচ্ছে। সূর্যের তেজই তো সেই শক্তি!

পদার্থ নিত্য, শক্তি নিত্য,—এ কথা দুটি এখন অন্যভাবে প্রকাশ করতে হবে। বলতে হবে, পদার্থ আর শক্তি দু-এ মিলে নিত্য।

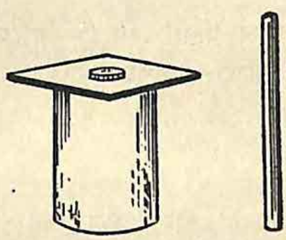
পদার্থের ধর্ম

প্রতি পদার্থের কয়েকটি ধর্ম আছে। তার মধ্যে একটা ধর্ম এই যে, পদার্থ কিছু না কিছু জায়গা জুড়ে থাকে। পদার্থ বলতে কি বুঝায়, এর উত্তরে এ-কথাও বলা চলে,—যা কিছু-না-কিছু জায়গা দখল করে থাকে, তাই হল পদার্থ।

একটা পদার্থকে বরাবর ভাগ করে যাওয়া চলে। একটা নুনের দানাকে দু টুক্‌রা করা হল। এর এক-এক টুক্‌রাকে আবার ভাঙা হল। এই রকম বরাবর ভেঙে যাওয়া হল। এখন কথা উঠল, এর কি শেষ নেই! বিজ্ঞানী অনেক রকম পরীক্ষায় জানলেন, এর শেষ আছে। ওই নুন শেষ অবধি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছবে, যখন আর ওকে ভাঙা চলবে না, অবশ্য ছুরি দিয়ে কেটে কেটে গিয়ে সে অবস্থায় আনা যাবে না। তবে অনেক রকমের অনেক পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী ওই সিদ্ধান্তে

আসলেন। এ অবস্থার ওই নুনকে বলা হয় নুনের অণু। এখনও জিনিসটা নুন, নুনের সব গুণ ওতে আছে। এইবার কিন্তু তড়িতের সাহায্যে ওই নুনের অণুকেও ভাঙা যাবে। তবে ভেঙে যা পাওয়া যাবে, তা মোটেই নুন নয়, একেবারে অন্য রকমের জিনিস। এ রকমভাবে জলের অণুকে ভেঙে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। জল তো তরল পদার্থ, কিন্তু ভেঙে যা পাওয়া গেল—সেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হল গ্যাস।

পদার্থের একটি মজার ধর্ম দেখা যায়। পদার্থ যদি স্থির থাকে তবে সে স্থির থাকতেই চাইবে ; আর যদি চলে তবে চলতেই তার প্রবণতা থাকবে। এর একটা মজার পরীক্ষা করা যায়। একটা গেলাসের উপর একখানা কার্ডবোর্ড বসান হল, কার্ডবোর্ডের উপর একটা টাকা রাখা হল। একটা লাঠি দিয়ে হঠাৎ কার্ডবোর্ডটাকে ঘা মারলে কার্ডবোর্ডটা ছিট্‌কে চলে যাবে, কিন্তু টাকাটা যাবে না। জোর আঘাতে কার্ডবোর্ডটা গতিযুক্ত হল, কিন্তু টাকাটা সেই গতি পাবার আগেই নিচে গেলাসের মধ্যে পড়বে।



চিত্র—1

কার্ডবোর্ডটাকে জোরে ঘা মারলে বোর্ডটা ছিট্‌কে চলে যাবে, কিন্তু টাকাটা নিচে গেলাসের মধ্যে পড়বে।

চলন্ত ট্রাম থেকে যখন আমরা নামি, তখন আমরা সুমুখের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ি। এখানে চলন্ত ট্রামের সঙ্গে আমাদের দেহেরও সামনের দিকে একটা গতি আসে। যেই নামলুম সঙ্গে সঙ্গে পা-এর গতি বন্ধ হল, কিন্তু শরীরের উপর দিকের গতি তখনও রইল, কাজেই দেহটা সামনে ঝুকে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম। আবার, ট্রাম

দাঁড়িয়ে, ট্রামে বসে আছি, হঠাৎ ট্রাম জোরে চলতে আরম্ভ করল। এবার উল্টো রকমের ব্যাপার হবে, পিছনের দিকে মাথা ঠুকে যাবে।

লাঠি দিয়ে জামায় ঘা দিলে জামা চট্ করে সরে যাবে। কিন্তু তার ধুলা তখনি সেই গতি পাবে না, জামা থেকে আলাদা হবে, আর আলাদা হয়ে নিচে পড়ে যাবে।

মাপজোখ

একজন বড় বিজ্ঞানী বলেছিলেন,—তুমি যে জিনিসের কথা বলছ, তা যদি মাপতে পার, সংখ্যা দিয়ে তা প্রকাশ করতে পার, তবে জানা যাবে সে সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞান আছে। কিন্তু তা যদি না পার, তবে বোঝা যাবে যে, সে-সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান খুব ভাসা-ভাসা।

পাথরটা 'ভারি', 'খুব ভারি', 'বড্ড ভারি', এ-সব কথার কোন মানে হয় না। এতে একজন যা বুঝবে, অপর একজন ঠিক তা না মনে করতে পারে। কিন্তু যদি বলা যায়, ওই পাথরটার ওজন এত সের বা এত পাউণ্ড, তবে ওই কথা যাকেই বলা যাক, প্রত্যেকেই ওই পাথরের ওজন সম্বন্ধে একই রকম বুঝবে।

'দিল্লী অনেক দূর' বা 'দিল্লী-মেল খুব জোরে যায়'—এও বিজ্ঞানের কথা নয়। বিজ্ঞান বলবে,—রেলপথে হাওড়া ও দিল্লীর মধ্যে দূরত্ব হল 903 মাইল, আর 'ওই পথটা যেতে দিল্লী-মেলের সময় লাগে 25 ঘণ্টা।

এইভাবে ছোট বড় যাবতীয় ঘটনা প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, সবার মূলে আছে মাত্র তিনটি কথা,—দূরত্ব, ওজন ও সময়। একটা বল ছুটে চলল। আমরা বলব, একটা গোল জিনিস, যার ব্যাসার্ধ এত, যার ওজন এত, এবং তা সেকেণ্ডে এতটা পথ অতিক্রম করছে। এ-রকম বর্ণনা করলে ব্যাপারটার মধ্যে আর কোন রকম অস্পষ্টতা থাকবে না, সকলেই এক রকম বুঝবে।

এখন দৈর্ঘ্য বা ওজন বা সময় প্রকাশ করতে হলে প্রত্যেকটার জন্যে এক একটি মাত্রা, একটি করে একক, ঠিক করে নিতে হয়। আমি যদি বলি,—ওই পাথরখানার ওজন 20, তবে সে কথারও কোন মানে হয় না। একটা একক ঠিক করে নিতে হবে, সের বা পাউণ্ড বা গ্র্যাম,

বা আর যা হয় কিছু। আর তার তুলনায় ওই ওজন প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ বলতে হবে, ওই পাথরের ওজন হল এত সের বা এত পাউণ্ড বা এত গ্র্যাম। সেই রকম, দূরত্ব আর সময়েরও এক একটা একক ঠিক করে নেওয়া চাই। এখন দেখা যাক, দূরত্ব, ওজন ও সময়, এদের প্রত্যেকের জন্যে কি কি একক ধরা হয়।

আগের দিনের কথায় আসা যাক। আমরা দেখি, তখন মানুষ তার নিজের দেহের একটা অঙ্গকে দৈর্ঘ্যের একক বলে ধরেছে। পা-এর দৈর্ঘ্যকে একক ধরেছে, হাতের কনুই থেকে বুড়ো আঙুলের ডগা অবধি দূরত্বকে একক ধরেছে। আবার এও দেখা যায়, এক জেলায় এক রকম একক চলিত আছে, অন্য জেলায় অন্য এক রকম। গণনা সম্বন্ধে নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি। এক পাড়াগাঁয়ে গিয়ে হাটে এক শ' আম কিনলুম। যে আম বিক্রি করছিল সে 140টা আম দিল। ইতস্তত করছি, লোকটা গুণতে এত ভুল করেছে! সঙ্গে সেই জায়গার যে লোক ছিল সে বলল,—ঠিকই হয়েছে, এখানে পাঁচটায় গণ্ডা, আর আটাশ গণ্ডায় শ'। মাপের সম্বন্ধে একটা বিদেশী গল্প এই রকম। এক মোটরচালক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ক্যানেডায় ঢোকবার আগে গাড়ির ট্যাঙ্ক পেট্রলে বোঝাই করে নিল, কারণ সে শুনেছিল ক্যানেডায় পেট্রলের দাম বেশি। ক্যানেডায় পৌঁছে দেখল সে ঠকেছে, কারণ সেখানকার গ্যালন যুক্তরাষ্ট্রের গ্যালনের চেয়ে শতকরা পঁচিশভাগ বেশি। মাপ ও ওজন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক জেলায় আজও পাকি সের, কাঁচি সের চলিত আছে।

আজ বিজ্ঞান সমস্ত পৃথিবীকে একসূত্রে বাঁধতে চলেছে, এখন মাপজোখ সম্বন্ধে পরস্পর ভুল বুঝলে কাজকর্ম অচল হয়ে আসবে। এখন একটা এরোপ্লেন বা ওই রকম কোন জটিল যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় তৈরি হচ্ছে। পরে এক জায়গায় তাদের মিলিয়ে সমস্ত যন্ত্রটা খাড়া করা হয়। এখন পরস্পর একটুও ভুল বুঝলে আর চলবে না। এখন মাপবার, ওজন করবার, সময় ঠিক করবার যে একক ধরা হবে, পৃথিবীর সব জায়গায় তা এক রকমের হতে হবে।

বিজ্ঞানের মাপজোখে এখন সকল দেশের সকল বিজ্ঞানী সেন্টিমিটারকে দূরত্বের একক, গ্র্যামকে ওজনের একক, আর সেকেণ্ডকে

সময়ের একক ধরেন। আমাদের দেশে সাধারণ কাজকর্মে কিন্তু অন্য রকম একক ব্যবহার করা হয়। মাপার একক ধরা হয় ফুট, ওজনের একক সের। অন্য কোন কোন দেশেও এই রকম গরমিল আছে। তবে সম্প্রতি আমাদের দেশে সেন্টিমিটার-গ্র্যাম একক প্রবর্তিত হতে চলেছে।

আজ সকল দেশে আন্দোলন উঠেছে, বিজ্ঞান যে একক ব্যবহার করে, সেই সেন্টিমিটার-গ্র্যাম-সেকেণ্ড সাধারণ কাজকর্মেও ব্যবহার করা হোক। এই তিনটি একক ব্যবহারে সুবিধা অনেক।

এক সেন্টিমিটারের
দশ ভাগের একভাগ হল মিলিমিটার,
দশ গুণ হল ডেসিমিটার,
একশ গুণ হল মিটার।

একটাকে আর একটায় নিয়ে যেতে শুধু দশেরই কারবার। কিন্তু ফুটকে ইঞ্চিতে বা গজে বা মাইলে নিয়ে যেতে গুণ-ভাগের কত হাংগামা করতে হয়।

তা ছাড়া, দৈর্ঘ্য প্রকাশ করতে যে কথাগুলি ব্যবহার করা হল, ওজন প্রকাশ করতে সেই একই কথা চলে। মোটের উপর সাধারণ কথাগুলি এই—(তা দৈর্ঘ্যই হোক বা ওজনই হোক, পাশে মিটার বসুক বা গ্র্যাম বসুক)—

ডেসি – দশ ভাগের একভাগ
সেন্টি – একশ ভাগের একভাগ
মিলি – হাজার ভাগের একভাগ

আবার

ডেকা — দশগুণ
হেক্টো – একশ গুণ
কিলো – হাজার গুণ।

এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য আর ওজনের মধ্যে একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন হল এক গ্র্যাম।

এ-সম্বন্ধে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারি, 1948)

প্রকাশিত শ্রীফণীন্দ্রনাথ শেঠের প্রবন্ধথেকে কিছু উদ্ধৃত করি—

"দশের ভাগে সমস্ত মুদ্রা, ওজন ও মাপ গোণার একক ধরে নিলে সব রকমের হিসাব সহজ ও সরল হবে। ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গণিতশিক্ষা সুখের হবে, সহজে শিখলে মনে রাখতে ও কাজ করতে পারবে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার একটা প্রধান বাহন হবে দশমীকরণ প্রথা। দেশী ও বিলেতী হরেক রকম মুদ্রা, ওজন ও মাপের অযৌক্তিক তালিকা মুখস্থ করতে হবে না। দুর্বোধ্য শুভঙ্করীর আর্যা, অবান্তর কড়া-ক্রান্তি-কাক-তিল ও তার নানা রকম আঁকড়ি-বাঁকড়ি, দাঁতভাঙ্গা কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, পণকিয়া, চোককিয়া, প্রভৃতি নীরস বিষয়গুলির হাত থেকে রেহাই পাবে। টাকা-আনা-পাই, মণ-সের-ছটাক, পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স প্রভৃতি মিশ্র যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, ঊর্ধ্বগ ও নিম্নগ লঘুকরণ, চলিত নিয়ম প্রভৃতি পাটীগণিতের অধ্যায়গুলি আর কচি কচি মস্তিষ্কগুলি পিষবে না। এই সব বালাই দূর হয়ে যাবে। শুধু শতকিয়া, নামতা ও সরল যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখলেই দৈনন্দিন ব্যাপারে সমস্ত সাধারণ কাজ চলবে। অথচ পরিবর্তনটা অতি সামান্য।"

"কেউ কেউ আপত্তি করেন যে, ভারত এখনও অশিক্ষিত, এখানকার অজ্ঞ নিরক্ষর লোকে দশমিক পদ্ধতি বুঝবে না। উত্তরে আমরা বলি, ভারত কি আফগানিস্থান, আবসিনিয়া, শ্যাম, সিংহল ইত্যাদি দেশের চেয়েও পিছুতে পড়ে আছে? সে-সব দেশে দশমিক পদ্ধতিতে কাজ চলছে কি করে? আসল কথা হচ্ছে, আমরা নতুন কিছু দেখলে আঁতকে উঠি, একটু তলিয়ে দেখি না তাতে ইষ্ট-অনিষ্ট কতখানি! আর দেশে নিরক্ষরতা চিরকাল এই রকমই থাকবে এরূপ ভাবা শিক্ষাভিমানীর কলঙ্ক। দেশে নিরক্ষরতা শীঘ্রই দূর করতে হবে বলেই দশমিক প্রথা আমরা চাই।"

এবার সময়-এর কথায় আসা যাক। সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা বড়ই গোলমেলে। আমরা বলে থাকি, 'সময় নষ্ট করো না', 'আমার একটুও সময় নেই,' 'আমার ঢের সময় আছে।' এ কথাগুলোর মানে কি তলিয়ে দেখা যাক। সামনে কতকগুলো জিনিস রয়েছে, জিনিস নষ্ট করো না বলা চলে। কিন্তু সময় তো দেখি না, অনুভব করি না,

এর কোন ওজন নেই, তা আবার নষ্ট করব কি? একটু ভাবলে দেখা যাবে, সময় কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আজ 30শে আষাঢ়। 29শে আষাঢ় বললে আমাদের মনে আসে গত কালের ঘটনাগুলি। কাল যদি অনেকগুলি ঘটনা ঘটে থাকে, তবে মনে হবে সময় যেন উড়ে গিয়েছে, আর যদি শুয়ে বসে কাটিয়ে থাকি, তবে কালকের দিনটা খুব লম্বা ছিল বলে মনে পড়বে। যে ছেলে পরীক্ষাঘরে লিখে চলেছে, তার কাছে তিন ঘণ্টা দেখতে না দেখতে কেটে গেল। আর যে লোক সেই পরীক্ষা তদারক করছে, তার কাছে ওই তিন ঘণ্টা যেন কাটেই না। পর পর ঘটনা থেকে আমাদের মনে সময়ের ধারণা আসে। কিন্তু ধারণা খুবই অস্পষ্ট, একজনের ধারণা অপর একজনের ধারণার সঙ্গে মিলবে না।

সময়ের মাপকাঠি ঠিক করবার জন্যে এমন ঘটনা ধরা হল যা নির্দিষ্ট ব্যবধান অন্তর অন্তর ঘটে চলেছে। পৃথিবী পুরো একটা পাক খাচ্ছে নির্দিষ্ট কাল অন্তর অন্তর। সেইটেকে ধরে সময়ের মাপকাঠি ঠিক হল। সূর্য ঠিক মাথার উপর যখন এল, আর তার পরদিন যখন আবার মাথার উপর এল,—এই কালটাকে 24 ভাগে ভাগ করলে যেটা হল, সেটাকে বলা হল ঘণ্টা, তার 60 ভাগের একভাগ হল মিনিট, এক মিনিটের 60 ভাগের একভাগ হল সেকেণ্ড। সেকেণ্ডই হল বিজ্ঞানে সময়ের একক বা মাপকাঠি।

তিনশ বছরের কিছু আগের কথা। ইটালীর পিসা শহরের গির্জার ভিতরে উপর থেকে শিকল দিয়ে একটা আলো ঝুলান ছিল। এক-একবার দমকা হাওয়া আসে, আর আলোটা দুলতে থাকে। তারপর হাওয়া যেই বন্ধ হয় অমনি দোলনের বিস্তার,—অর্থাৎ আলোটা যতটা দূর দূর দোলে,—ক্রমশ ছোট হয়ে আসে, শেষ অবধি দোলন থেমে যায়। একটি বালক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখল। হাজার হাজার লোক এর আগে ওই আলোটাকে ওই রকমভাবে দুলতে দেখেছে, কিন্তু ওই বালকের জানবার কৌতূহল হল, আলোটা একদিক থেকে অন্য দিকে দুলতে কতটা করে সময় নেয়। কিন্তু তখনও তো ঘড়ি বেরয় নি। বালক তার নাড়ীটা টিপে ধরল, আর নাড়ীর দপ্‌দপানি থেকে সময়ের একটা হিসেব পেল। ওই বালক হল

গ্যালিলিও, বিজ্ঞানী বলে যাঁর নাম পরে সমস্ত পৃথিবীতে ছেয়ে পড়ল।

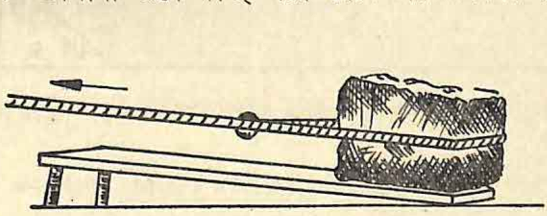
বালক দেখল, ঘড়িটা বেশি দূর-দূর দুলুক বা কম-কম দুলুক, অর্থাৎ দোলনের বিস্তার বেশি হোক বা কম হোক, সময় একই লাগে। বালক আরো অনেক পরীক্ষা করল। আর এটা লক্ষ্য করল, ওই দোলক লম্বায় ছোট হলে তাড়াতাড়ি দুলবে, সময় কম লাগবে; আর লম্বায় বড় হলে দুলতে সময় লাগবে বেশি। সতের বছরের ছেলে গ্যালিলিও এই যে নিয়ম বের করল, তাই হল দোলক-ঘড়ি তৈরির গোড়ার কথা। এখনও আমরা করি কি? দোলক-ঘড়ি ফাস্ট যাচ্ছে, তলার স্ক্রুটা ঘুরিয়ে দোলকের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দিই। শ্লো যাচ্ছে, স্ক্রুটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দৈর্ঘ্য ছোট করি।

যন্ত্র

সভ্য মানুষের চেষ্টা হল ভাল খাবার প্রস্তুত করা, ভাল পোষাক তৈরি করা, ভাল বাসস্থান নির্মাণ করা, জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করা। এ-সকল কাজে সে নানা রকমের যন্ত্র ব্যবহার করতে থাকল। এই সব যন্ত্রের অধিকাংশ এ-যুগের দান হলেও কিছু কিছু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে।

তীর-ধনুকের ব্যবহার প্রাচীন যুগের মানুষও জানত। চাকা একটা বড় আবিষ্কার। প্রাচীন কাল থেকে এর ব্যবহার চলে আসছে।

খুব ভারি একটা জিনিস রয়েছে, তাকে সোজাসুজি উঁচুতে তোলা দুঃসাধ্য। একখানা তক্তা কাত্ করে রেখে তার উপর দিয়ে জিনিসটা



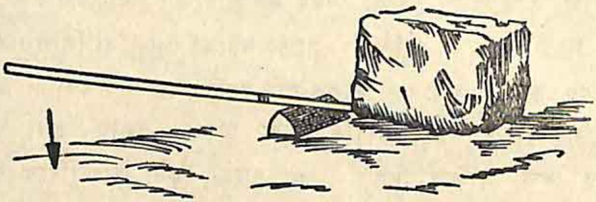
চিত্র – 2. আনত-তল

তুলতে থাকলুম। এখানে অল্প বল প্রয়োগ করে সহজে ওকে তোলা

সম্ভব হল। তবে একটা কথা আছে, জোর অল্প লাগল বটে, কিন্তু অনেকটা পথ টেনে নিয়ে যেতে হল।

এই আনত-তলের অসুবিধার কথা প্রাচীন যুগের মানুষও জানত।

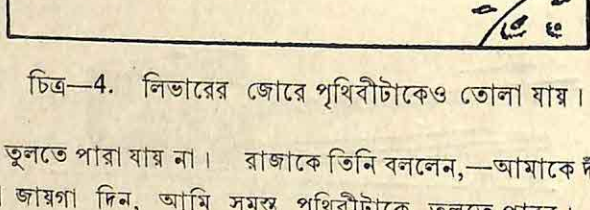
লিভারের ব্যবহারও বহু পুরান। লিভারের প্রধান অংশ হল একটা বড় ডাণ্ডা, একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে ডাণ্ডা উঠানামা করতে



চিত্র—3. লিভার

পারে। এই জায়গাটা ডাণ্ডার একধারের কাছাকাছি আছে, আর এই ধারে থাকবে ভারি জিনিসটা, যাকে তুলতে হবে। ডাণ্ডার অপর ধারে জোর লাগাতে হবে! ডাণ্ডার ওদিকটার তুলনায় এদিকটা যত বড় হবে, তত কম বল লাগিয়ে ভারি জিনিস তুলতে পারা যাবে।

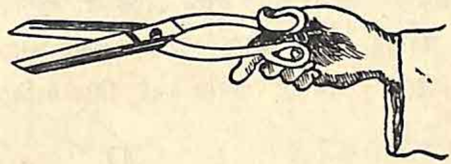
আর্কিমিডিস বলেছিলেন, একটা লিভারকে যদি অনেক বড় করতে পারা যায়, তবে এমন কোন ভারি জিনিস নেই, যা ওই লিভার



চিত্র—4. লিভারের জোরে পৃথিবীটাকেও তোলা যায়।

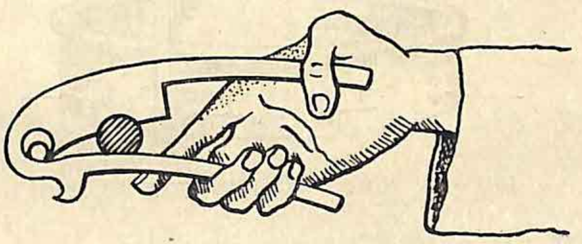
দিয়ে তুলতে পারা যায় না। রাজাকে তিনি বললেন,—আমাকে দাঁড়াবার একটা জায়গা দিন, আমি সমস্ত পৃথিবীটাকে তুলতে পারব। অবশ্য আর্কিমিডিস জানতেন, লিভারের ডাণ্ডাটা পৃথিবীর ভার বইতে পারার মতো শক্ত হওয়া চাই, আর পৃথিবীর বাইরে যেখানে তিনি দাঁড়াবেন

তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল হতে হবে। এ-দুটোর কোনটি সম্ভব নয়। আর্কিমিডিসের কল্পনায় যা দাঁড়ায় তার একটা ছবি পূর্বপৃষ্ঠায় দেওয়া হল।



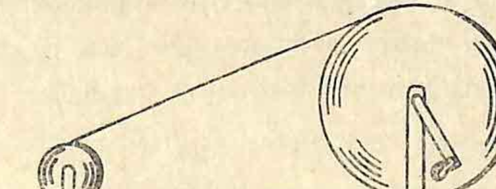
চিত্র—5. কাঁচিও এক রকম লিভার

যে লিভারের কথা বলা হল, কাঁচি সেই রকমের যন্ত্র। এ-সব লিভারে ডাণ্ডার একদিকে জিনিস থাকে, অপর দিকে বল প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু যেখানটা ঘিরে ডাণ্ডা উঠানামা করবে, তা ডাণ্ডার একেবারে শেষের দিকেও থাকতে পারে। জাঁতিতে এই রকম আছে। চিম্‌টে আর এক রকমের লিভার।



চিত্র—6. আর এক রকম লিভার জাঁতি

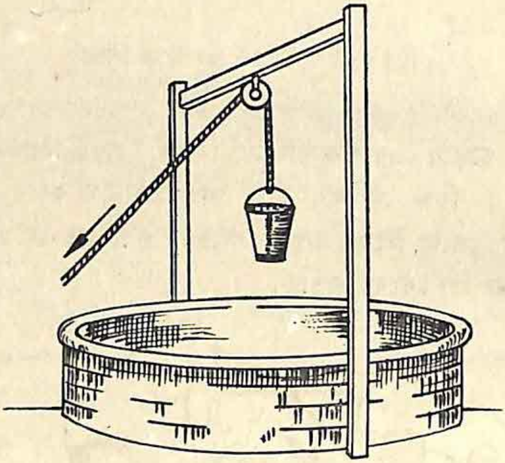
এক জায়গায় অল্প বেগ দিয়ে অন্য জায়গায় খুব দ্রুত বেগ পাওয়া যন্ত্রের আর এক কাজ। এসব ক্ষেত্রে একটা বড় চাকার সঙ্গে একটা ছোট চাকা ফিতে দিয়ে লাগান হয়, বড় চাকাকে এক পাক ঘোরালে



চিত্র – 7. চাকার ঘূর্ণনে বেগ বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত — চরকা

ছোট চাকা অনেক পাক ঘুরবে, কাজেই তার ঘোরার বেগ বাড়বে। চরকা, সেলাই-এর কল এই রকমের যন্ত্র।

কোন কোন যন্ত্রে সুবিধাজনক স্থান থেকে বা সুবিধাজনক উপায়ে বল প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা আছে। একটা ওজন উপরে তুলতে হবে, উপর থেকে টেনে তোলবার উপায় নেই, নিচে দাঁড়িয়ে একটা কপির



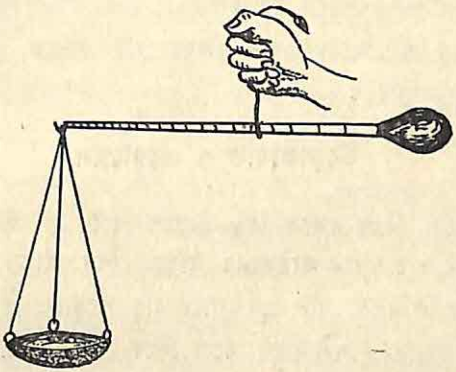
চিত্র—8. কপির সাহায্যে কুয়া থেকে জল তোলা

সাহায্যে ওই ওজনটিকে তুলতে পারা যায়। কুয়া থেকে জল তুলতে হবে। দড়ি-বাঁধা বালতিকে কুয়ায় নামিয়ে সোজাসুজি তুলতে পারি। এতে কিন্তু কুয়ার কিনারায় দাঁড়াতে হবে, আর হেঁট হয়ে টানতে হবে ; পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কপির সাহায্য নিলুম। কপির উপর দিয়ে দড়িটি গিয়েছে, দড়ির একদিকে বালতিটি ঝুলছে, আর দড়ির অপর দিক ধরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দড়িটা টানতে লাগলুম, জলভরা বালতি উঠতে লাগল। এখানে বলের দিক থেকে কোন সুবিধে হল না, কিন্তু টানবার দিকটা সুবিধামত ঘুরিয়ে নেওয়া হল।

একটি সাধারণ দাঁড়ি-পাল্লার ডাণ্ডার দু' দিকের দু' বাহু সমান পাল্লাদু'টির ওজনও সমান। এক পাল্লায় জিনিসটি বসান হল, অন্য পাল্লায় ওজন দেওয়া হতে থাকল। গোড়ায় ডাণ্ডাটি অনুভূমে ছিল, দু'দিকে ওজন চাপিয়ে যখন ডাণ্ডাটিকে আবার অনুভূমে আনা হল, তখন

এক পাল্লায় যে-ওজন চাপান হল, তা হল অপর পাল্লায় বসান ওজনের সমান। গোড়াতে ডাণ্ডা যদি অনুভূমে না থাকে, তবে পাষাণ ভেঙে নেওয়া হয়, অর্থাৎ যে-দিকে পাল্লা উঠে আছে সেই দিকের পাল্লায় যথাযথ ওজন চাপিয়ে ডাণ্ডাকে অনুভূমে আনা হয়। এ হল সাধারণ তুলা।

কিন্তু এখনও দূর-পল্লীগ্রামে এক রকমের তুলা ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণ দাঁড়িপাল্লা হতে একেবারে অন্য রকমের। এতে ডাণ্ডার



চিত্র – 9. এক রকম তুলা

একদিকে একটা ভারি বল আছে, অন্য দিকে একটা হুক লাগান। যার ওজন বের করতে হবে, তাকে হুক থেকে ঝোলান হয়। অনেক সময় হুক থেকে সোজাসুজি না ঝুলিয়ে হুকে একটা পাল্লা আটকান থাকে, আর সেই পাল্লাটায় জিনিসটি বসান হয়। ডাণ্ডাটিতে দাগ কাটা কাটা আছে, আর ভিন্ন ভিন্ন দাগ থেকে পাল্লাটাকে ঝোলান যায়। যে দাগ থেকে ঝোলালে ডাণ্ডাটি অনুভূমে আসবে, তাই দেখে ওই জিনিসের ওজন ঠিক করা হয়। এ-সব তুলায় আগে থেকে নানা রকমের জানা-ওজন চাপিয়ে ওই দাগগুলির সংখ্যা স্থির করা হয়।

স্টেশনে মাল ওজন করবার যে তুলা থাকে, তা আর এক পদ্ধতিতে তৈরি। কতকগুলি লিভারের সাহায্যে একটা ছোট ওজন দিয়ে একটা ভারি জিনিস তৌল করা হয়।

বর্তমান কালে যন্ত্রের নির্মাণকৌশল এত উন্নত হয়েছে, আর এর ব্যবহার এত ছড়িয়ে পড়েছে যে বর্তমান যুগকে যন্ত্র-যুগ বলা হয়।

ছোট একটি হাতঘড়ির কলকজা কি সূক্ষ্ম, আর কি কৌশলে সমস্ত জিনিসটা তৈরি! কি বিরাট একটা কাপড়ের কল! একটা রোটারি ছাপাখানা থেকে ঘণ্টায় এক লক্ষ খবরের কাগজ ছেপে বেরল! এই সকল যন্ত্র দেখলে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই।

কিন্তু যন্ত্রযুগের যন্ত্রগুলি অসাধারণ হলেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ওই সব যন্ত্রের অনেক অংশ কতকগুলি সাধারণ রকমের যন্ত্র দিয়ে তৈরি, যদের কয়েকটির কথা আগে বলা হল।

আজ যে-যন্ত্র সবচেয়ে বেশি বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, এখন সে-সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা যাক।

উড়োজাহাজ ও এরোপ্লেন

বায়ুর মধ্যে দিয়ে কোন কিছু উড়তে পারে দু' উপায়ে। এক, জিনিসটা যদি তার সমান আয়তনের বায়ুর চেয়ে হাল্কা হয় তবে তা উড়বে, আর জিনিসটা যদি খুব জোরে বায়ু কাটাতে থাকে তবে সেটা বায়ুর চেয়ে ভারি হলেও বায়ুর মধ্যে দিয়ে তাকে চালান যাবে।

বাজারে ছোট ছেলেদের জন্যে রবারের বেলুন বিক্রি হয়। বেলুনটা ফোলান। তলায় একটা সুতো বাঁধা থাকে, সুতোটা ছেড়ে দিলে বেলুন উপরে উঠে যায়। এখানে ওই বেলুন হাইড্রোজেনে ভরা থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস বায়ুর চেয়ে হাল্কা, ফলে হাইড্রোজেন-ভরা বেলুনটা সমপরিমাণ বায়ুর চেয়ে হাল্কা হাওয়ায় ওটা উপরে উঠে গেল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে এই বেলুন আর উঠবে না, ভিতরের হাইড্রোজেন পাতলা রবারের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, বেলুনটা চুপ্‌সে পড়বে, নেবে যাবে। এর কারণ, উপর দিকে বায়ু ক্রমে পাতলা ও হাল্‌কা হয়ে গেছে।

দেওয়ালির সময় আকাশে যে ফানুস তোলা হয়, তাতে হাইড্রোজেন ভরা হয় না বটে, তবে মূল কথাটা একই। এই ফানুসের তলায় একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলি স্পিরিটে ডুবিয়ে জালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে, ফানুসের ভিতরকার বায়ু গরম হতে থাকে। এখন গরম বায়ু সম-আয়তনের ঠাণ্ডা বায়ুর চেয়ে হাল্কা, তাই সমস্ত ফানুসটা তার সমান আয়তনের বাইরের

বায়ুর চেয়ে হাল্কা হওয়ায় উপরে উঠতে থাকল। শেষে ন্যাক্‌ড়া যখন নিবে গেল, ভিতরের বায়ু আর গরম রইল না, তখন ফানুসটা আস্তে আস্তে নামতে লাগল।

মানুষ হাইড্রোজেন-ভরা খুব বড় ফানুস তৈরি করতে আরম্ভ করল, যা তাকে নিয়ে আকাশে উড়বে। জার্মানিতে এই পদ্ধতির জাহাজ বেশি তৈরি হতে থাকল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'জেপলিন' নামে উড়ো-জাহাজ যাত্রী ও ডাক নিয়ে জার্মানি ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করতে থাকল। 'হিণ্ডেনবার্গ' নামে উড়োজাহাজ সবচেয়ে বড় ছিল। লম্বায় ছিল 803 ফুট, গড়ে 40 জন যাত্রী নিয়ে এই জাহাজ জার্মানি ও আমেরিকার মধ্যে যাওয়া আসা করত। কিন্তু একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটল। 1937 সালের 6 মে যখন ওই জাহাজ উঠতে যাবে, তখন ভিতরের হাইড্রোজেন-এ আগুন ধরে গেল, আর বহু লোকের চোখের উপর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উড়োজাহাজ 32 সেকেণ্ডের মধ্যে একটা জ্বলন্ত ধাতুর পিণ্ডে পরিণত হল। হাইড্রোজেনের বদলে হিলিয়ম গ্যাস ব্যবহার করলে এ-রকমটা আর হত না; কারণ, হিলিয়মও বায়ুর চেয়ে হাল্কা, অথচ এতে আগুন ধরে না। কিন্তু জার্মানিতে হিলিয়ম গ্যাস মিলে না। এই ব্যাপারের পর থেকে ওই রকমের হাইড্রোজেন-ভরতি উড়োজাহাজের আর চলন রইল না।

কিন্তু পাখি উড়ে কি করে? সে তো সম-আয়তনের বায়ুর চেয়ে ভারি! পাখির ডানা আছে, ডানা নেড়ে বায়ু কাটিয়ে কাটিয়ে সে চলে। মানুষেরও শখ হল সে পাখির মতো উড়বে। সে তার শরীরের সঙ্গে দু'খানা ডানা বেঁধে উড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু তার মতো ভারি জিনিসকে চালিয়ে নিয়ে যেতে যে-রকম তাড়াতাড়ি ডানা নাড়তে হবে, সে-রকম শক্তি মানুষের নেই। বেশ, একটা হাল্কা যান তৈরি করা যাক, তাতে পাখা লাগান একটা মোটর থাকুক, পাখা জোরে ঘুরে সমস্ত যানটাকে বায়ু ভেদ করে নিয়ে চলবে। এখন দেখতে হবে, মোটরটা নিজে একটা বিষম বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়। সে সমস্যার সমাধান হল। মোটর হল শক্ত অথচ হাল্কা ধাতুর, আর তা চলল হাল্কা পেট্রলে। কিন্তু গোড়াতেই এ-সব হয়নি। তাছাড়া, অনেক বিজ্ঞানী তখন একটা নিরাশার কথা বললেন। তাঁরা বললেন,—আচ্ছা বেশ, এসব না হয় হল,

কিন্তু জিনিসটা তো বায়ু ভেদ করে চলবে, বায়ু একটা বাধা দেবে। আর তার বেগ যত বাড়বে, বাধাও তত বাড়বে। অধ্যাপক ল্যাংলি কিন্তু হিসেব করে বললেন,—না, ঠিক তা নয়, বেগ যত বাড়বে বাধা তত কমবে, আর সেই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে তিনি একটি ছোট এরোপ্লেন তৈরি করলেন। 1896 সালে এই এরোপ্লেন উড়ল, আর প্রতিবারে মাত্র আধ মাইল পথ অতিক্রম করতে লাগল। কিন্তু লোকে একে শুধু বিজ্ঞানীর এক খেয়াল বলে ধরে নিল। 1903 সালে ল্যাংলি মানুষ বইতে পারে, এই রকমের এক এরোপ্লেন তৈরি করলেন, কিন্তু উড়বার আগেই এক দুর্ঘটনায় তা নষ্ট হয়ে গেল। ল্যাংলির মোটর ছিল ভারি। 1903 সালের 17 ডিসেম্বর উইলবার রাইট আর তার ভাই আরভিন রাইট সর্বপ্রথম এরোপ্লেনে বায়ু ভেদ করে চললেন। ওই এরোপ্লেনের মোটরকে পেট্রল দিয়ে চালান হল।

প্রথম যাত্রায় এরোপ্লেন মাত্র 12 সেকেণ্ড আকাশে ছিল, আর 120 ফুট পথ অতিক্রম করেছিল। সেদিন যতবার উড়েছিল, তার সবশেষ যাত্রায় 59 সেকেণ্ডে 852 ফুট পথ গিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের এই সাফল্যের মূলে ছিল ল্যাংলির কথা। ল্যাংলি প্রমাণ করলেন যে, এরোপ্লেনের বেগ যদি এক নির্দিষ্ট সীমায় এসে পৌঁছয়, তবে বাতাসের বাধা খুবই কমে আসবে। তাই এরোপ্লেন চালনায় সর্বপ্রধান ব্যাপার হল শক্তিশালী মোটর তৈরি করা। 1903 সালের পরীক্ষার পর রাইটরা দু'ভাই গোপনে তাঁদের যন্ত্রের উন্নতিসাধন করতে লেগে গেলেন। কিন্তু মানুষের পক্ষে আকাশে উড়া যে সম্ভব, লোকে সেকথা বিশ্বাস করে না। তারা বলে যে, ভগবানের যদি সেই ইচ্ছা থাকবে, তবে তিনি মানুষকে পাখা দিতেন। কিন্তু মানুষ পাখা না পেলেও পেয়েছে বুদ্ধি !

1905 সালে 5 অক্টোবর রাইটরা ঘণ্টায় $38\frac{1}{2}$ মাইল হিসেবে চলে $28\frac{1}{2}$ মাইল পথ অতিক্রম করলেন। তখন লোকের চোখ খুলল। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নানাভাবে যন্ত্রনির্মাণ-কৌশল উন্নত হতে লাগল। লর্ড নর্থক্লিফ ঘোষণা করলেন, ইংলিশ প্রণালী যে এরোপ্লেনে পার হতে পারবে তাকে হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। 1909 সালে 25 জুলাই একজন ফরাশি যুবক ইংলিশ প্রণালী

পার হয়ে এই পুরস্কার লাভ করলেন। এর পরের বছর আর একজন ফরাশি যুবক লণ্ডন থেকে ম্যানচেষ্টার, 183 মাইল পথ, উড়ে গিয়ে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন।

মানুষের চেষ্টারও বিরাম নেই, সাহসেরও অন্ত নেই। 1919 সালে অ্যালকক্ আর ব্রাউন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়র্ল্যাণ্ড, 1963 মাইল পথ, 15 ঘণ্টা 57 মিনিটে অতিক্রম করে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন, আর 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হলেন।

1927 সালের 20 মে সকাল 7টা 52 মিনিটের সময় একটি পঁচিশ বছরেরর যুবা একখানি ছোট এরোপ্লেন নিয়ে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর থেকে উপরে উঠলেন, উদ্দেশ্য আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে আসবেন, দূরত্ব 3600 মাইল। যুবকের নাম লিণ্ডবার্গ। অসংখ্য লোক শহরের ময়দানে জমা হয়েছিল, ঔৎসুকের সঙ্গে তারা উপরের দিকে তাকিয়ে রইল, এরোপ্লেন ও এরোপ্লেনের আরোহীকে বোধ হয় এই শেষ দেখা। মুহূর্তের মধ্যে এরোপ্লেন অদৃশ্য হল।......সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় একখানা এরোপ্লেনকে ফ্রান্সের সারবুর্গ পার হতে দেখা গেল। প্যারিসের কাছাকাছি নামবার মাঠে অসংখ্য লোক আকাশের দিকে তাকিয়ে, উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়েছে, লিণ্ডবার্গ কি পৌছতে পারবে? রাত্রি দশটা দশ মিনিটের সময় একখানা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল! এটা কি লিণ্ডবার্গের এরোপ্লেন! বোধ হয়। বোধ হয় নয়! অল্প কয়েক মিনিট গেল, হ্যাঁ, লিণ্ডবার্গের প্লেনই বটে! দেখতে দেখতে পাক খেতে খেতে এরোপ্লেন মাটিতে নামল। লোকের কি বিপুল আনন্দ! লিণ্ডবার্গ বহু পুরস্কার, বহু পদক পেলেন। ফরাশি রাষ্ট্রের সভাপতি, বেলজিয়মের রাজা, ইংলণ্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁকে সম্মানিত করলেন। শুনা যায়, তিনি ডাকে 35 লক্ষ অভিনন্দন পত্র পেয়েছিলেন।

অল্প দিনের মধ্যে ওদিকে ইংলণ্ড-আমেরিকা আর এদিকে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যাত্রী ও ডাক এরোপ্লেনে নিয়ে যাতায়াত করতে থাকল। 1937 সালে 14 জুন রাশিয়ার তিন জন বৈমানিক মস্কো থেকে যাত্রা করে কোথাও না থেমে 62 ঘণ্টায় 6900 মাইল পথ অতিক্রম

করে কালিফর্নিয়ায় এসে পৌঁছলেন। বৈমানিক এরোপ্লেনে করে উত্তর মেরুতে উপস্থিত হয়ে সেখানকার অনেক সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরলেন।

এরোপ্লেন চালনায় মহিলারাও পশ্চাদ্‌পদ রইলেন না। অ্যামিলিয়া ইয়ারহার্ট আটলান্টিক পার হলেন, এমি জন্‌সন আফ্রিকায় গেলেন, অস্ট্রেলিয়ার দিকে ছুটলেন।

বৈমানিক উপরে উঠলেন, সেখানকার আবহাওয়ার অনেক খবর নিয়ে নামলেন।

1872 সালে জুল ভার্নের একখানা বই বেরয়, বই-এর নাম '80 দিনে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ'। এটা ছিল একটা কল্পিত কাহিনী, আর এ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্তও পাঠকরা এই বইখানা খুব কৌতূহলের সঙ্গে পাঠ করত। এদিন যে কখনও আসতে পারে, 80 দিনে যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা যেতে পারে, এ তারা কল্পনাতেও আনতে পারেনি। আর আজ একখানা এরোপ্লেনে চড়ে পৃথিবী ঘুরে আসতে 8 দিনও লাগে না।

শব্দ যায় এক সেকেণ্ডে 1120 ফুট। এরোপ্লেন এ বেগও ছাড়াল। আর এ তো হল আজকের কথা! কাল কি দাঁড়াবে কে জানে!

জল

জীবন ধারণের জন্য বায়ু তো চাইই, কিন্তু জলও চাই। জলের অভাবে আমরা বেশি দিন বাঁচতে পারিনে। আমরা সোজাসুজি জল পান করি, আবার নানারকম খাদ্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেহে জল আসে। পৃথিবীতে জল অফুরন্ত।

অল্প মাত্রায় জলের কোন রং নেই, তবে বেশি গভীর হলে নীল দেখায়। জলের তেমন কোন স্বাদও নেই।

জলের বিশেষ ধর্ম হল, এ গড়িয়ে চলে, আর সব সময় নিচের দিকে গড়ায়। গেলাসের জল পড়ে গেল, জল নিচের দিকে গড়িয়ে চলল। বৃষ্টির জল ছাত থেকে নল দিয়ে উঠানে পড়ল, সেখান থেকে পাশের নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে বাইরের নিচু জমিতে চলে গেল। জলের এই ধর্মের সাহায্য নিয়ে বড় বড় শহরে বাড়ি বাড়ি জল-সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। কলকতা শহরের কথা ধরা যাক। সেখানে শহরের একপাশে এক উঁচু

জায়গায় খুব বড় একটা ট্যাঙ্ক আছে। যন্ত্র দিয়ে ওই ট্যাঙ্কে জল তোলা হয়। এখন ট্যাঙ্ক থেকে নল বেরিয়ে এসে রাস্তার নিচে দিয়ে গিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছেছে, নলের মধ্যে দিয়ে জল গড়িয়ে গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে হাজির হচ্ছে।

একখানা খুব ভারি পাথর আছে, বহুকষ্টে পাথরখানা তোলা যায়। পাথরখানা এবার জলে ফেলে দেওয়া হল। এখন দেখা যাবে, জলের মধ্যে ওকে তুলতে আর তত কষ্ট হচ্ছে না। কোন জিনিসকে জলের মধ্যে ওজন করলে তার ওজন কমে যায়। কতটা কমে? জিনিসটার সমান-আয়তন জলের যা ওজন সেই ওজন কমে। আর শুধু জল নয়, প্রত্যেক তরল পদার্থ, এমন কি গ্যাসীয় পদার্থ সম্বন্ধেও এ নিয়ম খাটে।

ভাসা ও ডোবা

সাধারণত আমরা বলে থাকি যে, ভারি জিনিস জলে ডোবে, হাল্কা জিনিস জলে ভাসে। আচ্ছা, একটা লোহার পেরেকের চেয়ে নিশ্চয় একটা বড় কাঠ ভারি। অথচ দেখা যায়, পেরেক ডোবে, কাঠ ভাসে। আসলে, যখন 'ভারি', 'হাল্কা' কথা দু'টি ব্যবহার করা হয়, তখন তার মানে এই ধরা হয়, সমান আয়তনের জলের চেয়ে 'ভারি' বা 'হাল্কা'। একটা পেরেক তার সমান আয়তনের জলের চেয়ে ভারি, তাই পেরেক ডোবে, আর ওই বড় কাঠ তার সমান আয়তনের জলের চেয়ে হাল্কা, তাই ও জলে ভাসে। আচ্ছা, লোহার পেরেক ডোবে, কিন্তু লোহার কড়া তো ডোবে না, লোহার কড়া জলে ভাসে। তা হয় কেন? এখানে লোহাকে পিটিয়ে পাতলা করে বেঁকিয়ে একটা পাত্র করা হয়েছে। কড়াটা জলে দিলে যে আয়তন জল সে সরাবে সেই আয়তনের জলের চেয়ে কড়া হাল্কা, তাই কড়াটা ভাসল। কড়াটা যদি নিরেট হত, খোলটা খালি না থেকে যদি লোহায় ভর্তি থাকত, লোহারও দরকার নেই যদি জলে ভর্তি থাকত, তাহলে নিশ্চয় সেটা ডুবত। লোহার কড়া যে-কারণে ভাসে, একই কারণে লোহার জাহাজও জলে ভাসে। কিন্তু জাহাজে কতক দূর পর্যন্ত জল ঢুকে গিয়ে ভারী হলে জাহাজ ডোবে।

মানুষের দেহ তার সমান আয়তন জলের চেয়ে অল্প একটু হাল্কা, তাই মানুষ জলে ভাসে। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। মানুষের

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে তার মাথাটা অপেক্ষাকৃত বেশি ভারি। মাথাটা জলের মধ্যে যেতে চায়, অথচ শ্বাস নিতে হলে মাথাটাকে জলের উপর ভাসিয়ে রাখতে হবে। আমরা যখন সাঁতার শিখি, তখন মাথা ভাসিয়ে রাখার কৌশলটাই শিখি। কিন্তু জন্তুজানোয়ারের মাথা তার বাকি অঙ্গের তুলনায় হাল্কা, তাই তাকে চেষ্টা করে সাঁতার শিখতে হয় না।

এখন যে জিনিস জলে ভাসছে, তার কতটা অংশ জলের ভিতরে থাকবে, আর কতটা অংশ বাইরে থাকবে ? এ-সম্বন্ধে নিয়মটা হল এই : তরল পদার্থের মধ্যে যে অংশটা থাকবে, ততটা আয়তনের ওই তরল পদার্থ সমস্ত জিনিসটার ওজনের সমান হবে। লোহার কড়াটা যখন জলে ছেড়ে দেওয়া হয় কড়ার খানিকটা নেমে গিয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়। এখন, ওই কড়া যতটা আয়তনের জলকে সরাচ্ছে, ততটা আয়তনের জলের ওজন সমস্ত কড়াটার ওজনের সমান হবে।

এইবার ধরা যাক, কড়াটা জলে না ভাসিয়ে দুধের উপর ভাসান হল। এখন জলের তুলনায় দুধ অপেক্ষাকৃত একটু বেশি ভারি। সুতরাং অপেক্ষাকৃত কম আয়তনের দুধ ওই কড়ার ওজনের সমান হবে। কাজে কাজেই দুধের ওপর কড়াটা আরও একটু বেশি ভাসবে।

ল্যাক্টোমিটার

কাচের তৈরি একটা ফাঁপা নল আছে, নলটার সব দিক বন্ধ। নলের ভিতরে তলার দিকে অল্প একটু সীসা বা পারা আছে, যাতে করে নলটা সোজা দাঁড়িয়ে থেকে ভাসতে পারে। নলের গায়ে কাটা কাটা দাগ আছে। নলটা দুধের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল, আর দুধের উপরের তলে যে দাগটা এসে দাঁড়াল তা লক্ষ্য করা গেল। এইবার নলটা জলে ভাসান হল। দুধের চেয়ে জল হাল্কা, সুতরাং নলটা আর একটু বেশি নেমে যাবে। খাঁটি দুধে কোন্ দাগ অবধি নামে আমরা জেনে রেখে দিলুম। গয়লা দুধ দিয়ে গেল। এই দুধে নলটা ভাসিয়ে দিলুম। যদি দেখি এই দুধে নলটা আগের দাগের চেয়ে বেশি নেমে গেল, তবে নিশ্চয় বুঝব, গয়লা দুধে জল মিশিয়েছে। আর যত

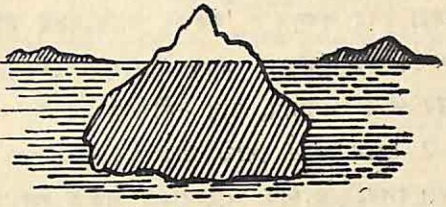


চিত্র—10
ল্যাক্টোমিটার

বেশি নামবে, তত বেশি জল মেশান হয়েছে, বুঝতে হবে। এই যন্ত্রের নাম 'ল্যাক্টোমিটার'। এ দিয়ে দুধ খাঁটি কি জল-মেশান তা আমরা ধরতেপারি। তবে গয়লা যদি জল ঢেলে উপযুক্ত পরিমাণ চিনি মিশিয়ে দুধের ঘনত্ব ঠিক রাখে, তবে এই উপায়ে দুধে জল মেশান হয়েছে কি না, আমরা ধরতে পারব না।

হিমশৈল

বরফ সমান-আয়তনের জলের চেয়ে হাল্কা, তাই বরফ জলে ভাসে। কথাটা অন্য ভাবেও ধরা যায়। বরফ যখন গলে জল হবে, তখন সেই



চিত্র—11. হিমশৈল

জলের আয়তন বরফের আয়তনের চেয়ে কম হবে। বরফ জলে ভাসে, কিন্তু তার আয়তনের বেশির ভাগ জলের ভিতরে ডুবে থাকে, অতি কম অংশ জলের উপরে দেখা যায়। শীতপ্রধান অঞ্চলে সমুদ্রের মধ্যে হিমশৈল ভাসতে থাকে, তার সামান্য কিছু অংশ জলের উপর দেখা যায়। তাই এমনও হয়েছে, জাহাজ খুব জোরে চলতে চলতে জলের ভিতরে ওই প্রায়-অদৃশ্য বরফের স্তূপে ধাক্কা লেগে একেবারে ভেঙেচুরে গিয়েছে। 1912 সালে 'টাইটানিক' নামে এক বড় জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে এই রকমভাবে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়, বহু যাত্রী মারা যায়।

ডুবো-জাহাজ

ডুবো-জাহাজ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে সমস্ত জাহাজখানি সমান আয়তনের জলের চেয়ে অল্প একটু হাল্কা হয়। এরকম অবস্থায় ওটা ভাসে, তবে ওর বেশির ভাগ জলের ভিতর থাকে, অল্প একটু বাইরে দেখা যায়। এই সব 'সবমেরিনে'র মধ্যে বড় বড় ট্যাঙ্ক রাখা হয়। সাধারণত ট্যাঙ্কগুলো খালি থাকে, তবে ইচ্ছে করলে তাদের

ভিতর জল ঢোকান যায়। জল ঢোকালে সমস্ত জাহাজটা সম-আয়তনের জলের চেয়ে ভারি হয়, তখন একেবারে ডুবে যায়। অবশ্য চোঙের মাথাটা জলের উপর থাকে, যাতে করে বাইরে কোথায় কি হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে তা দেখা যায়, আর ভিতরে বায়ুও ঢুকতে পারে। সবমেরিন ভেসে ছুটেছে। দেখা গেল, শত্রুর জাহাজ তাকে লক্ষ্য করেছে। নিমেষের মধ্যে ট্যাঙ্কে জল ঢোকান হল; সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ডুবে শত্রুর অদৃশ্য থেকে এ চলতে লাগল।

আপেক্ষিক গুরুত্ব

লোহা জলের চেয়ে ভারি? কত গুণ ভারি? ধরা যাক, এটা পরীক্ষায় আমরা বের করলুম। যতগুণ ভারি সেই সংখ্যাটাকে বলা হয় লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। দেখা গেল, লোহাটার ওজন 16 গ্র্যাম, আর পরীক্ষায় বেরল, তার আয়তনের জলের ওজন 2 গ্র্যাম। এ থেকে জানা গেল, লোহা জলের 8 গুণ ভারি। আমরা বলব, লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব হল 8। পরীক্ষাটি কি ধরণের হবে তার হদিস দেওয়া যাচ্ছে।

একটা ভাল তুলায় জিনিসটার ওজন বের করা হল। এইবার সেই জিনিসটাকে জলের মধ্যে রেখে তার ওজন বের করা হল। এখন ওজন কমবে। কতটা কমবে? আমরা জেনেছি সম-আয়তন জলের যে ওজন ততটা ওজন কমবে। এর থেকে সম-আয়তন জলের ওজন কত জানা যাবে। ধরা যাক, জিনিসটার বায়ুতে ওজন ছিল 16 গ্র্যাম, আর জলের মধ্যে ওজন 14 গ্র্যাম; কমল 2 গ্র্যাম। তা হলে 2 গ্র্যাম হল সম-আয়তন জলের ওজন। সুতরাং আপেক্ষিক গুরুত্ব হল 8।

তরল পদার্থের বেলায় এই রকম করা হয়। একটা খালি বোতল ওজন করে ওজনটা টুকে রাখলুম। এবার ওটা জল ভরে ওজন করলুম। এই ওজন থেকে খালি বোতলের ওজন বাদ দিলে ওই বোতলে যা ধরে সেই আয়তন জলের ওজন বেরল। এই রকম করে ওই আয়তনের তরল জিনিসটার ওজনও বের করা হল। সুতরাং ওই তরল পদার্থটা সম-আয়তনের জলের কতগুণ ভারি আমরা পেলুম। এইটেই হল ওই তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব।

কয়েকটি জিনিসের আপেক্ষিক গুরুত্ব মোটামুটি এই—

সোনা—19
রুপা—$12\frac{1}{2}$
তামা—9
লোহা—$8\frac{1}{2}$
অ্যালুমিনিয়ম—3
কাচ—$2\frac{1}{2}$

আবার তরল পদার্থের মধ্যে—

পারা—$13\frac{1}{2}$
দুধ—একের অল্প একটু বেশি
জল—এক। (জলকে একক ধরেই তো অন্য জিনিস কতগুণ ভারি ঠিক করা হয়।)
সরিষার তেল—·9; জলের চেয়ে হাল্কা, সুতরাং একের কম হবে।
স্পিরিট—·8

এই তালিকার দিকে তাকালেই আমরা বলে দিতে পারি, কে কার উপর ভাসবে।

পারার চেয়ে সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি, লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব কম। সুতরাং পারাতে সোনা ডুববে, লোহা ভাসবে।

সরিষার তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের চেয়ে কম, সুতরাং জলের উপর সরিষার তেল ভাসবে।

বায়ু

খাদ্য না হলে আমাদের চলে না, জল না হলেও চলে না, কিন্তু এদের অভাবে আমরা কয়েক দিন বাঁচতে পারি। বায়ু না পেলে কিন্তু আমরা এক ঘণ্টাও বাঁচতে পারিনে। এ বায়ু আমরা পাই কোথায়?

গেলাসে খানিকটা জল আছে, বাকিটা খালি, মনে হয় কিছু নেই। ঘরের মধ্যে লোকজন রয়েছে, আসবাবপত্র রয়েছে; মনে হয়, বাকিটা শূন্য। কিন্তু ওসব জায়গা মোটেই খালি নয়। গেলাসে জল ছাড়া

আছে বায়ু, ঘরের সব খালি জায়গায় বায়ু রয়েছে। বাইরে চারদিকে, উপরে অনেক দূর অবধি বায়ু রয়েছে, বায়ুসমুদ্রে আমরা ডুবে আছি। যদিও এই বায়ু আমরা দেখতে পাইনে, তবু নানা রকমে বুঝতে পারি যে বায়ু রয়েছে। ঝড়-ঝাপটা তো একথা জানায়, কিন্তু বায়ু যখন একেবারে ধীর স্থির, তখন একখানা পাখা নাড়লে আমরা বুঝতে পারি, বায়ুর মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে আমরা বাস করছি।

বায়ু সব সময়ই চঞ্চল। যখন ধীর স্থির বলে মনে হচ্ছে, তখনও বায়ু এদিক-ওদিকে চলে বেড়ায়। তাই যখন কাছে গোলাপ, বেল, বকুল, হাস্নাহানা প্রভৃতি ফোটে, যখন কেউ সুগন্ধি মেখে ঘরে ঢোকে, তখন আমাদের নাক গন্ধে ভরে উঠে। বায়ুই ওই গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে, বায়ুর নিজের কোন গন্ধ নেই।

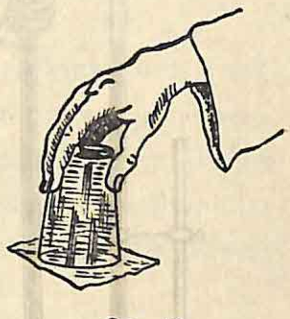
বায়ুর গন্ধ নেই, আবার কোন রংও নেই।

বায়ুর এক বিশেষ ধর্মের জন্যে এর মধ্য দিয়ে শব্দ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। বায়ুর এ ধর্ম যদি না থাকত, তবে একজনের ঠোঁট নড়ছে শুধু এইটুকু দেখতুম, তার কথা শুনতে পেতুম না।

বায়ুর চাপ

বায়ুর ওজন আছে। এ ওজন খুবই কম। আমরা বায়ুর মধ্যে রয়েছি বলে আমাদের শরীরের চারদিক থেকে বায়ু চাপ দিচ্ছে। হিসাবে দেখা গিয়েছে, দেহের প্রতি এক ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া জায়গার উপর বায়ুর চাপ পড়ছে প্রায় সাড়ে সাত সের। সমস্ত শরীরের উপর কত পড়ছে ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু দেহের উপর এত চাপ যদি পড়ে, তবে সে চাপ আমরা টের পাইনে কেন? ঠিক যে কারণে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুব দিলে উপরকার জলের চাপ টের পাইনে। দু' ব্যাপারেই চাপ আশে-পাশে উপর-নিচে সব দিক থেকে সমানভাবে পড়ে বলেই তা বোঝা যায় না।

বায়ু যে উপর দিকেও চাপ দেয় সহজেই তা দেখান যায়। একটা গেলাস কানায় কানায় জলে ভর্তি করা হল, ভর্তি করে মুখটা একখানা কাগজ দিয়ে ঢেকে ফেলা গেল, ভিতরে একটুও বায়ু না থাকে। এখন গেলাসের মুখের কাগজখানা হাত দিয়ে চেপে ধরে গেলাসটা উল্টে ধরা হল। উল্টোবার সময় ভিতরে একটুও বায়ু না ঢোকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। এইবার হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলে দেখা যাবে, কাগজখানা গেলাসের মুখে আটকে রইল, আর জল একটুও পড়ল না। গেলাসের জল নিজের ভারে নিচের দিকে যে চাপ দিচ্ছে, তার চেয়ে বায়ুর উপর দিকের চাপ অনেক বেশি; সেই চাপ কাগজখানা ও গেলাসের ভিতরকার জলকে উপরে ধরে রাখল।



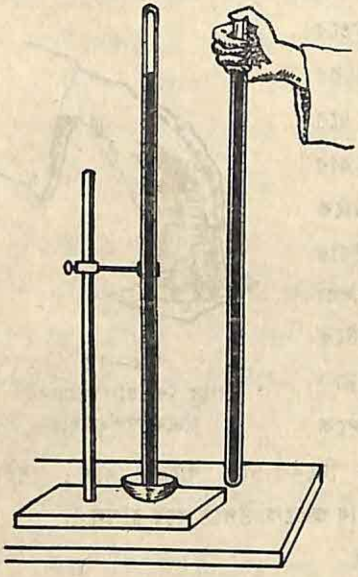
চিত্র—12
বায়ুর উর্ধ্ব চাপ গেলাসের জলকে ধরে রেখেছে

বায়ুর চাপ মাপবার ব্যবস্থা হল।

ব্যারোমিটার

একটা প্রবাদ আছে যে, প্রতি আবিষ্কারের মূলে থাকে মানুষের গরজ। বায়ুর চাপ-মাপা যন্ত্রের আবিষ্কারেও এই রকমের এক ব্যাপার ছিল। 1600 খ্রীস্টাব্দে টস্কানির ডিউক একটা কুয়া খুঁড়িয়ে তাতে একটা পাম্প লাগালেন। এর আগেও জল তোলবার জন্য পাম্প ব্যবহার করা হত। কিন্তু এ কুয়ায় জল ছিল খুব নিচে, 34 ফুটেরও বেশি নিচে। পাম্প দিয়ে কিছুতেই জল তোলা গেল না। ডিউক গ্যালিলিওকে একথা জানালেন। গ্যালিলিও তখন বৃদ্ধ, রুগ্ন। তিনি তাঁর ছাত্র টরিসেলির উপর এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দিলেন। টরিসেলি ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, ওই লম্বা নলে যে কতকটা উঁচু অবধি জল তোলা যাচ্ছে, তা সম্ভব হচ্ছে নলের অপর মুখে বায়ু ঠেলা দিচ্ছে বলে। আর এই রকম যদি হয়, তবে 34 ফুটের কাছাকাছি উঁচু জলের স্তম্ভের যে ওজন, সেইটেই হবে বায়ুর চাপ। তিনি আরও ভাবলেন, বায়ু যদি 34 ফুট জল ধরে রাখতে পারে, তাহলে জলের বদলে যদি পারা

নেওয়া যায়, তবে পারা অনেক কম উঁচুতে উঠবে। কতটা উঠবে? পারা জলের সাড়ে- তের গুন ভারি, সুতরাং ৩৪ ফুটের মাত্র সাড়ে-তের ভাগের একভাগ উঠবে। সেটা দাঁড়ায় প্রায় 29 ইঞ্চিতে।



চিত্র—13 সাধারণ ব্যারোমিটার

পারা নেওয়া হল, পারা ওই 29 ইঞ্চি উঠে দাঁড়াল, আর উঠল না। টরিসেলি তাঁর এক বন্ধুকে পরীক্ষাটা দেখালেন, আর তাঁরা দু'জনে মিলে বায়ুর চাপ মাপবার একটা যন্ত্র তৈরি করলেন। এই রকম যন্ত্রকে বলা হয় ব্যারোমিটার।

তাহলে, একটা ব্যারোমিটার সহজে এইরকম করে তৈরি করা যেতে পারে। প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা কাচের নল নেওয়া হল। নলটা পুরাপুরি পারায় ভর্তি করা হল, একটুও বায়ু ভিতরে না থাকে। এইবার মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হল। আর একটা বড় পাত্রে খানিকটা পারা আছে। এখন নলটা উল্টে ধরে নলের মুখটা বড় পাত্রটার পারার মধ্যে নিয়ে গিয়ে মুখটা ছেড়ে দেওয়া হল। খুব সাবধান হতে হবে, একটুও বায়ু ভিতরে না ঢুকে যায়। এখন দেখা যাবে, নলের ভিতরে পারা কিছুটা নেমে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। এইবার মাপলে দেখা যাবে, নলের ভিতরে পারা বাইরের পাত্রের পারা থেকে প্রায় 29 ইঞ্চি উপরে দাঁড়িয়েছে। এখানে পারার উপরে নলের মধ্যে একটুও বায়ু নেই। সুতরাং ওই পারার চাপ হল বাইরের বায়ুর চাপের সমান। নলের মধ্যে পারার উপর কি আছে? কিছুই নেই! এই প্রথম বায়ুশূন্য স্থান পাওয়া গেল।

প্যাস্কাল প্রশ্ন তুললেন, আচ্ছা, বায়ুর চাপ যদি ব্যারোমিটারের পারাকে ঠেলে তোলে, তবে পর্বতের উপর তো বায়ুর চাপ কম, সেখানে তো পারা অতটা উঠবে না। প্যাস্কাল তাঁর কোন আত্মীয়কে এই ব্যারো-

মিটার দিয়ে একটা উঁচু পর্বতের উপর পাঠালেন। খবর এল, পারা তিন ইঞ্চি নেমেছে। তখন আর এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

বায়ু-চাপের হ্রাস

বাইরে বায়ুর চাপ যদি কমে, তবে ব্যারোমিটারের পারা নামবে, আবার চাপ বাড়লে পারা উঠবে। ঝড়বৃষ্টি হবার আগে বায়ুর চাপ কমে। সুতরাং ব্যারোমিটারের পারা নামছে দেখলে বুঝতে হবে, শিগ্‌গির ঝড়বৃষ্টি আসবে। পারা কতটা উঁচুতে আছে, তার সূক্ষ্ম মাপজোখ নিয়ে হাওয়া-আপিস থেকে ঝড়বৃষ্টি আসার খবর আগে থেকে লোকদের জানান হয়।

বায়ু-চাপের কারণ

এখানে একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের কোন ভুল ধারণা না থেকে যায়। বায়ুর ওজন আছে, পৃথিবীর উপর অনেক দূর অবধি বায়ু রয়েছে, তারই ওজনের জন্যে কি বায়ুর চাপ? একটা মুখ-খোলা শিশি রয়েছে, বাইরের বায়ুর সঙ্গে তার যোগ রয়েছে, কাজেকাজেই সমস্ত বায়ুর চাপ ওই শিশির উপর পড়ছে, এ না হয় ধরে নিলুম। কিন্তু এইবার শিশির মুখটা ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দিলুম। এখন শিশির ভিতরে তো অল্প কিছু বায়ু রয়েছে, সে-বায়ুর ওজন কতটুকুই বা! তবে কি শিশির ভিতর বায়ুর চাপ কমে গেল! মোটেই না। ছিপি বন্ধ করবার আগে যে চাপ ছিল এখনও ঠিক তাই আছে। আর একটা কথা ধরা যাক। একটা বাক্সে কতকগুলি বই রয়েছে, বাক্সের তলায় তার চাপ পড়ছে, কিন্তু বাক্সের চারদিকে উপরের ডালিতে কি চাপ পড়ছে? একটুও না। কিন্তু ওই শিশির মধ্যে, যে-কোন বন্ধ জায়গায়, যে বায়ু রয়েছে তার চারদিকে চাপ রয়েছে, নিচে আশেপাশে এমনকি উপরের দিকেও। ওজনের জন্যে চাপ তো শুধু নিচের দিকেই হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

প্রতি পদার্থ হল সেই পদার্থের কতকগুলি ছোট ছোট কণার সমষ্টি। তারা এত ছোট যে তাদের চোখে দেখা যায় না। এই কণাগুলি স্থির নেই, সব সময় ছুটোছুটি করছে। গ্যাসের কণাগুলি প্রচণ্ড বেগে দৌড়াদৌড়ি করে। দৌড়তে গিয়ে যে পাত্রের ভিতর তারা বন্ধ হয়ে রয়েছে তার গায়ে

ধাক্কা দিচ্ছে। এই ধাক্কাই হল চাপ। এই বদ্ধ গ্যাসকে যদি গরম করা যায়, তবে কণাগুলির দৌড়াদৌড়ি বাড়বে, চাপ বাড়বে। যদি আয়তন কম করে ফেলা হয়, তবে আরও ঘন ঘন ধাক্কা দেবে, চাপ বাড়বে। এই হল আসল ব্যাপার।

পাম্প

পাম্প অনেক রকমের হয়।

এক রকম পাম্পের কাজ আমরা প্রত্যেকেই সব সময় অনুভব করছি। আমাদের বুকের মধ্যে যে ফুস্‌ফুস রয়েছে, সেই ফুস্‌ফুস হচ্ছে একটা পাম্প। ফুস্‌ফুসটা যেই ফুলছে, অমনি তার ভিতরের বায়ুর আয়তন বাড়ছে, চাপ কমছে। চাপ কমে যাবার ফলে বাইরে থেকে বায়ু এসে ফুস্‌ফুসে ঢুকছে। এই হল শ্বাস নেওয়া। ফুস্‌ফুস হল যেন একটা হাপর।

পিচকারিতে জল ওঠে এই রকমে। পিচকারির মুখটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে ডাণ্ডাটা টানা হল। এই ডাণ্ডাকে বলা হয় পিস্টন। পিস্টন যেই উপরে উঠল, ভিতরের আয়তন বাড়ল, সুতরাং চাপ কমল। চাপ কমবার ফলে বাইরের বায়ুর চাপ জলকে ঠেলে পিচকারির মধ্যে তুলল। এখন পিচকারির মুখটা জল থেকে তুলে পিস্টনটা ঠেলতে থাকলে যে-জল উঠেছিল, পিচকারির মুখ দিয়ে তা বেরতে থাকবে।

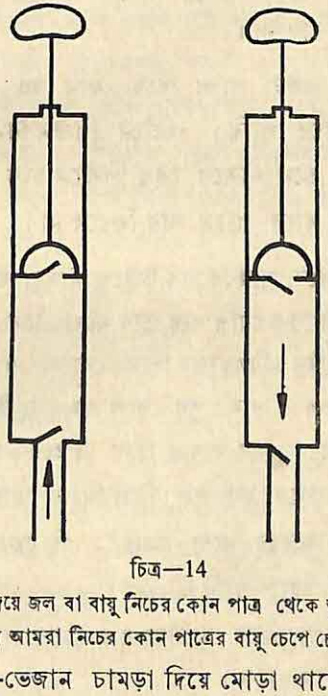
একটা ড্রপার দিয়ে আমরা জল বা কালি বা চোখে-দেবার ওষুধ তুলি। তাতে ওই একই ব্যাপার ঘটছে। ড্রপারের মুখটা ওই তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিয়ে উপরের রবারটা টিপলুম। ভিতরের কিছু বায়ু বেরিয়ে গেল। এইবার রবারটা ছেড়ে দিলুম, আয়তন আগের মতো হল, সুতরাং চাপ কমল। চাপ কমায় বাইরের বায়ুর চাপ কিছু পরিমাণ তরল পদার্থকে ভিতরে ঠেলে দিল।

নানা রকমের কাজের জন্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পাম্প ব্যবহার করে থাকি। কোন পাম্প দিয়ে একটা বদ্ধ জায়গা থেকে বায়ু বের করি। আবার ফুটবলের ব্লাডারে, সাইকেলের নলে বায়ু ঠেসে দি অন্য রকমের পাম্প দিয়ে। কুয়া থেকে জল তুলি এক রকমের

পাম্প দিয়ে, আবার দমকলে অন্য রকমের পাম্প লাগিয়ে দূরে ও উঁচুতে খুব জোরে জল পাঠাই।

সব রকম পাম্পের একটা বিশেষ অংশ হল ভাল্‌ভ। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাল্‌ভ ব্যবহার করা হয়, তবে সব ভাল্‌ভেই এই রকম ব্যবস্থা থাকে যে, জল বা বায়ু এক দিক থেকে অন্য দিকে যেতে পারে, কিন্তু যে পথ দিয়ে গেল সে পথ দিয়ে ফিরতে পারে না। এই ভাল্‌ভ কোথাও বা কপাটের মতো, এক দিকে ঠেললে খোলে, কিন্তু বিপরীত দিক দিয়ে ঠেললে আরো চেপে বন্ধ হয়। আবার একটা মোচার ডগার মতোও ভাল্‌ভ হয়, একটা গর্তের মুখে বসান। এক দিকে চাপ পড়লে গর্তের মুখ খুলে যায়; অন্য দিক দিয়ে চাপ এলে মুখটা চেপে বন্ধ হয়ে যায়।

জল-তোলা পাম্পে একটা মোটা শক্ত চোঙের মধ্যে একটা পিস্টন যাতায়াত করে। পাশ দিয়ে বায়ু না বেরিয়ে যায় সেজন্য পিস্টনটার



চিত্র—14

বাঁ দিকের পাম্প দিয়ে জল বা বায়ু নিচের কোন পাত্র থেকে তুলতে পারি,
ডান দিকের পাম্প দিয়ে আমরা নিচের কোন পাত্রের বায়ু চেপে চেপে দিতে পারি।

মুখ সাধারণত তেলে-ভেজান চামড়া দিয়ে মোড়া থাকে। চোঙের মুখে

একটা নল লাগান আছে, আর এখানে একটা ভাল্‌ভ রয়েছে। ভাল্‌ভটি চোঙের ভিতর দিক খোলে। পিস্টনটাতেও আর একটা ভাল্‌ভ লাগান আছে, সেটাও উপরের দিকে খোলে। চোঙের সঙ্গে যে-নল লাগান হয়েছে, সে-নলের মুখ কুয়ার জলের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে। গোড়াতে পিস্টনটি চোঙার তলায় রইল। এখন ওকে টেনে তোলা হয়। বাইরের বায়ুর চাপ চোঙার মধ্যে জল ঠেলে দিল। পিস্টনটিকে এইবার চাপা হল। এই জল আর কুয়ায় ফিরে যেতে পারল না, কারণ, জলের চাপে ওদিকের ভাল্‌ভ জোরে বন্ধ হবে। কিন্তু সে-চাপে পিস্টনে লাগান ভাল্‌ভ খুলল, চোঙার জল এই ভাল্‌ভ দিয়ে উপরে উঠল। এখানে চোঙার গায়ে লাগান আর একটা নল দিয়ে জল বাইরে পড়তে লাগল। আগের কথাটায় আবার আসা যাক। কুয়ার মধ্যে জল যদি 34 ফুটেরও বেশি নিচে থাকে, তাবে এ পাম্প দিয়ে জল উঠবে না। এর কারণ, বায়ুর চাপই তো জলকে ঠেলে তোলে ; কিন্তু 34 ফুটের বেশি সে তো তুলতে পারে না। কার্যত কিন্তু ওটা 34 ফুটেরও কিছু কম, কারণ পিস্টনের গা দিয়ে বায়ু ঢোকা একেবারে বন্ধ করা যায় না।

এই রকমের একটা পাম্প দিয়ে কোন বদ্ধ জায়গা থেকে আমরা বায়ু বের করে নিতে পারি। এখানে পিস্টন টানলে পাত্র থেকে প্রথম ভাল্‌ভ দিয়ে বায়ু চলে আসবে, কিন্তু পিস্টনে চাপ দিলে এ-বায়ু উপরের ভাল্‌ভ দিয়ে বাইরে যাবে, পাত্রে আর ফিরবে না।

ফুটবলের ব্লাডারে, সাইকেলের টিউবে আমরা উল্টো রকম করি। বায়ু বের করে নিই না, আরও বেশি বায়ু তার মধ্যে ঠেসে ঠেসে দিই। এ পাম্পে ভাল্‌ভ আগেকার ঠিক বিপরীত দিকে খোলে ও বন্ধ হয়। পিস্টনটা টানলুম, এখন নিচেকার ভাল্‌ব খুব চেপে বন্ধ হল, উপরকার ভাল্‌ব খুলল, সেখান দিয়ে বাইরে থেকে বায়ু চোঙার ভিতরে ঢুকল। পিস্টন চাপলে উপরকার ভাল্‌ভ জোরে বন্ধ হল, কিন্তু নিচের ভাল্‌ব এখন খুলল, আর ওই বায়ু এখন ব্ল্যাডারের মধ্যে ঢুকল। এই রকমে আমরা ঠেসে ঠেসে ব্ল্যাডারের মধ্যে বায়ু ভরতে পারি।

যে-ধরনের পাম্প দিয়ে ব্লাডারে বায়ু চেপে দেওয়া হয়, সেই ধরনের পাম্পই দমকলে লাগান থাকে।

স্টোভে পাম্প চালালে ভিতরের বায়ুর উপর চাপ পড়ে, সেই চাপে কেরোসিন তেল স্টোভের মুখে ওঠে, আর সেখানকার উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হয়ে জ্বলতে থাকে।

পৃথিবীর উর্ধ্বে বায়ু

পৃথিবীর উপর তো বায়ু রয়েছে, এ-বায়ু কতদূর অবধি গিয়েছে। বায়ুর চাপ মেপে ঠিক হিসেব করা যাবে না ; কারণ, বায়ু উপর দিকে ক্রমশ ক্রমশ খুব পাতলা হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর উপর তো বায়ুর ঝড়-ঝাপটা চলেছে, অনেক উপরেও কি সে রকম হচ্ছে ? তাপ কি সেখানে কমে আসছে ? মানুষের এসব খবর চাই ! সে বেলুনে চড়ে উপরে উঠল, কিন্তু কিছু দূর উপরে গিয়ে দেখল বায়ু এত হাল্কা হয়ে এসেছে যে, তাতে শ্বাস নেওয়া যায় না। সে অক্সিজেন সঙ্গে নিয়ে উঠল, সেই অক্সিজেন তাকে বাঁচিয়ে রাখল। যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে গেল, অনেক রকম পরীক্ষা করে নামল।

1931 সালে 27 মে বেলজিয়মের অধিবাসী পিকার্ড নামে এক ভদ্রলোক এক নতুন ধরনের বেলুন তৈরি করে তাতে চড়ে উপরে উঠলেন, উপর দিকে তিনি দশ মাইলের কাছাকাছি গেলেন, সেখানকার অনেক খবর নিয়ে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা আকাশে থেকে নিরাপদে নামলেন। এর পর তিন জন রাশিয়াবাসী উঠলেন। পিকার্ড যতটা উঠেছিলেন তাঁরা তাও ছাড়ালেন, তাঁদের যন্ত্র অনেক খবর নিয়ে ফিরল, কিন্তু তাঁরা আর জীবিত অবস্থায় মাটিতে পা দিলেন না। তারপর 1935 সালে 11 ডিসেম্বর অ্যাণ্ডারসন ও স্টিভেন্স সাড়ে-তের মাইল অবধি উঠলেন। এই সবচেয়ে বেশি উপরে উঠা। তাঁরা দেখলেন, সেখানে বায়ু স্থির, খুব ঠাণ্ডা, আকাশ দেখাচ্ছে ঘোর কাল, সূর্যের আলো অত্যন্ত প্রখর আর ধব্‌ধবে সাদা, চোখ খোলা রাখলে একেবারে অন্ধ হয়ে যেতে হয়।

উপর দিকে বায়ুর যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, তার মধ্যে একটা স্তর ভারি মজার। সেখানে ঝড় নেই, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, বাতাস মৃদুমন্দ বইছে, খুব হাল্কা হয়ে গেছে ; সুতরাং বাতাসের বাধা দেবার শক্তি খুব কমে এসেছে। এখন এরোপ্লেন চালকরা ভাবছেন, ভবিষ্যতে তাঁদের এরোপ্লেনকে যদি এই স্তরে এনে ফেলা যায়, তবে যন্ত্র চালান খুব সহজ হয়ে আসবে, আর এখন যে-বেগে এরোপ্লেন ছুটছে, বেগ তার আপনা থেকে

দুগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু অন্য বাধাও তো খুব! এই স্তরটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, আর সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন নিতে হবে, তা না হলে আরোহীরা প্রাণে বাঁচবে না।

কিন্তু কথা এই, মানুষের সাহসের কি অন্ত নেই, আর তার কল্পনারও কি শেষ নেই!

শব্দ

শব্দের অনুভূতি

টং টং টং করে ঘড়িতে নটা শব্দ হল। শুনে ছেলের মনে পড়ে গেল স্কুলের বেলা হয়েছে। মস্তিষ্ক হুকুম চালাতে থাকল। হাতকে খবর দিল, —বই-খাতা বন্ধ করে গুছিয়ে রাখ। পা-কে জানাল, বইখাতা গোছান হলে স্নান করতে যেতে হবে। হাত বই-খাতা গোছাল, পা তাকে নিয়ে চলল যেখানে তেল গামছা আছে, চোখ জায়গাটা চিনিয়ে দিল, তেল গামছা দেখিয়ে দিল। ছেলে তেল মাখল, নাক তাকে জানাল তেলের গন্ধটা কেমন। সে স্নান করল, গায়ের চামড়া বলে দিল জলটা ঠাণ্ডা কি গরম। স্নান শেষ করে সে খেতে বসল, এখন জিব তরকারিগুলো কেমন হয়েছে তার আস্বাদ দিল।

মানুষের হৃৎপিণ্ড একবার কোঁচকাচ্ছে, পরমুহূর্তে ফুলছে, এর আর বিরাম নেই। ফলে মানুষের সমস্ত দেহে রক্তস্রোত বইছে। মানুষের ফুস্ফুস হাপরের মতো একবার ফুলছে, তারপর কুঁচকে যাচ্ছে, এতে শরীরের রক্ত চলাচল করছে। মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্য জীর্ণ হচ্ছে, আর খাদ্যের সারাংশ রক্তে চলে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু মানুষের শরীরে তো নয়, জন্তুজানোয়ারের দেহেও এই একই ব্যাপার চলেছে। তবে মানুষের বিশেষত্ব কোথায়?

মানুষের বুদ্ধিশক্তি আছে, স্মৃতিশক্তি আছে, কাজের ফলাফল বিচার করবার ক্ষমতা আছে। একখানা ছবি দেখলে সে পুলকিত হয়, একটা গান শুনলে সে আনন্দ বোধ করে। শীতকালে সে গায়ে গরম কাপড় জড়ায়, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খায়। বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলবার তার অসাধারণ ক্ষমতা। এইসব ক্ষমতা জন্তুজানোয়ারের কিছু কিছু থাকলেও অতটা পরিস্ফুট হয়নি, মানুষে যতটা হয়েছে।

মানুষের মাথার খুলির মধ্যে আছে তার মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের তলা থেকে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে মোটা দড়ির মতো একটা জিনিস চলে গিয়েছে। এই জিনিসটাকে বলা হয় সুষুম্না-কাণ্ড, ইংরেজিতে বলে স্পাইনাল-কর্ড। এই সুষুম্না-কাণ্ড থেকে অনেক নার্ভ শরীরের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আবার শরীরের অনেক জায়গা থেকে অনেক নার্ভ এই সুষুম্না-কাণ্ডে এসে মিশেছে। মানুষের মস্তিষ্ক সুষুম্না-কাণ্ডের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন নার্ভ দিয়ে তার শরীর ও মনকে পরিচালনা করছে। এই নার্ভের মধ্যে কতগুলি চোখ, কান, নাক, জিব, ত্বক থেকে এসে মস্তিষ্কে যথাযথ অনুভূতি দিচ্ছে, আর কতকগুলি আছে যাদের দিয়ে মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্ন পেশীতে সংবাদ পাঠাচ্ছে। এক দল অন্তর্মুখী, অপর দল বহির্মুখী।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন সৈন্যদল থাকে। এক এক দল এক এক রকমের কাজ করে, কিন্তু মাথার উপর একজন সেনানায়ক থাকেন, যিনি সকলকে চালান। দেহের সেই সেনানায়ক হল মস্তিষ্ক। কিন্তু মস্তিষ্কের ঠিক নিচের অফিসর হল সুষুম্না-কাণ্ড। পায়ে একটা মশা বসেছে। অন্তর্মুখী নার্ভ সুষুম্না-কাণ্ডকে এই খবরটা দিল। সুষুম্না-কাণ্ড মস্তিষ্কে খবরটা পাঠাল, সেখান থেকে হুকুম এল কি করতে হবে। সুষুম্না-কাণ্ড বহির্মুখী নার্ভ দিয়ে হাতের পেশীকে হুকুম করল চড় দিয়ে মশা মারতে হবে, আর পা-এর পেশীকে জানাল পা সরিয়ে নাও। কিন্তু কোন কোন সময় দেখা যায়, মস্তিষ্ক বিচার করে হুকুম দেবার আগেই সুষুম্না-কাণ্ড একটা ব্যবস্থা করে বসেছে। অস্পষ্ট আলোয় রাস্তায় দড়ির মতো একটা জিনিস দেখলুম, চম্‌কে উঠলুম, আর দৌড় দিলুম। সুষুম্না-কাণ্ড নিজেই এই ব্যবস্থা করল। এটাকে বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া—রিফ্লেক্স অ্যাক্‌সন। কিন্তু ওই রকম ব্যবস্থা করে সুষুম্নাকাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে খবরটি মস্তিষ্কে পাঠিয়েছে। মস্তিষ্কের বিচার বিভাগ বলল,—আরে দূর, ওটা সাপ নয়, দড়ি। অপ্রস্তুত হলুম, আর চারিদিকে তাকালুম, বোকামোটা নিকটে কারুর কাছে ধরা পড়েছে কি না।

মানুষের শরীরে কিন্তু আর এক শ্রেণীর নার্ভ আছে যারা স্বাধীনভাবে কাজ করে, মস্তিষ্কের ধার ধারে না। মানুষের হৃৎপিণ্ড এই জাতীয়

নার্ভ দিয়ে শরীরে রক্ত চালায়, মস্তিষ্কের হুকুমের অপেক্ষা রাখে না। আমরা ইচ্ছা করি, না করি, হৃৎপিণ্ডের কাজ চলতে থাকে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—এই ভিন্ন ভিন্ন রকমের অনুভূতি কোথাকার কোন্ নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছে দেখা যাক।

আমাদের মুখমণ্ডলে দুটি কোটর আছে, তার মধ্যে আছে দুটি চোখ। চোখের প্রধান অংশ হল অক্ষিপট—রেটিনা। ক্যামেরায় যেমন লেন্সের সাহায্যে পিছনে একটা ফটোগ্রাফি কাচের উপর বা একখানা ফিল্মের উপর বাইরের বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, এখানেও সেইরকম চোখের লেন্স ওই রেটিনার উপর দৃশ্য জিনিসের প্রতিবিম্ব ফেলছে। এখন এই রেটিনা থেকে একটি নার্ভ মস্তিষ্কে চলে গিয়েছে। রেটিনায় যেই কোন বাইরের বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ল অমনি ওই নার্ভ মস্তিষ্ককে জানান দিল, আমরা জিনিসটা দেখলুম।

জিবের উপর কতকগুলি ছোট-ছোট গুটি আছে, তারাই নার্ভের সাহায্যে স্বাদের অনুভূতি দেয়।

নাকের গর্তের পিছনে কতকগুলি বিশেষ কোষ থাকে, আর সেখান থেকে কতকগুলি নার্ভ চলে গিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছেছে। বাইরে বাতাস হাস্নাহানার উপর দিয়ে বয়ে এল, এসে নাকের ভিতর ঢুকল, তখন ওই নার্ভগুলি উত্তেজিত হয়ে মস্তিষ্কে খবর দিল, আমরা গন্ধ অনুভব করলুম। নাক যখন সর্দিতে ভরা থাকে, তখন ওই কোষগুলি ঢাকা থাকায় আমরা তখন গন্ধ পাই না।

স্পর্শ করে আমরা জিনিসের অস্তিত্ব বুঝি, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব করি। ত্বক হল এর ইন্দ্রিয়। ত্বকের সঙ্গে অসংখ্য নার্ভ যুক্ত আছে, তারা স্পর্শের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছে দিচ্ছে।

এইবার শোনা। শুনি আমরা কান দিয়ে, আর কানের ভিতর থেকে কতকগুলি নার্ভ চলে গিয়ে মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি দিচ্ছে।

একটা কথা চলিত আছে,—পৃথিবীতে জীব আছে, তাই আলো আছে, শব্দ আছে; জীব না থাকলে আলো শব্দ কিছুই থাকত না। কথাটা খুবই ঠিক। তুমি বলবে,—ঈথর-তরঙ্গ তো আলো, আর বায়ুর

ঢেউ তো শব্দ ; আমি থাকি আর না থাকি তারা তো থাকছে, সুতরাং আলোও থাকছে, শব্দও থাকছে। কিন্তু তা তো নয়। ঈথর-তরঙ্গ আমার চোখের উপর পড়ে রেটিনায় পৌঁছল, তার সঙ্গে যুক্ত নার্ভকে উত্তেজিত করল, সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছল, তখনই তো অনুভূতি হল আলোর। মনে কর, জীব নেই, জীবের চোখ নেই, চোখের রেটিনা নেই, রেটিনার সঙ্গে যুক্ত নার্ভ নেই, মস্তিষ্ক নেই, তবে কোথায় আলো, কোথায় আলো! জীব না থাকলে শব্দই বা কি? এতো তারই একটা অনুভূতি মাত্র!

কান

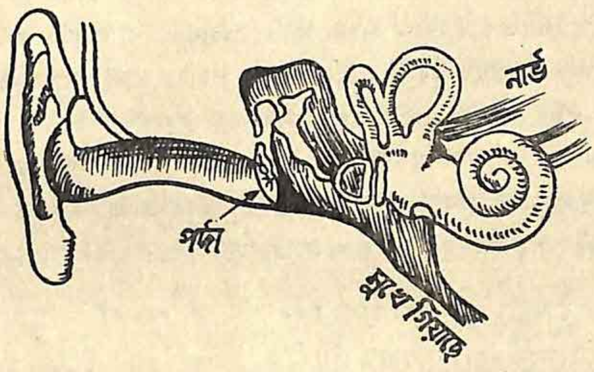
মহাকর্ষ-তত্ত্ব আলোচনা করে আইনস্টাইন বলেছিলেন,—এই বিশ্বের স্রষ্টা কি রকম জানিনে, তবে তিনি যে একজন বড় গণিতজ্ঞ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের দেহযন্ত্রের গঠন আর তার বিভিন্ন অংশের কাজ দেখলে বলতে হয়—জীবের স্রষ্টা আর যাই হোন, তিনি একজন বড় শারীরবিদ্যা-বিশারদ।

কানের কথাটা ধরা যাক। কি বিচিত্র তার গঠন, আর কি অদ্ভুত তার সব কাজ!

কানের বাইরের অংশ শব্দ ধরে। কিন্তু এখানে জন্তুদের কাছে মানুষের হার। কোন্ দিক থেকে শব্দ আসছে, তা ঠিক করবার জন্য পশুরা কানটা ঘুরিয়ে সেইমুখো করে, কিন্তু মানুষ তার কান ইচ্ছামতো ঘুরোতে পারে না, সমস্ত মাথাটা ঘুরোয় যাতে কান সেইমুখো হয়। মেগাফোন, গ্রামোফোন চোঙার যে কাজ কানের এই অংশের সেই কাজ ; এই অংশ বায়ুর অনেকগুলি ঢেউ ধরে ঘুরিয়ে ভিতরে চালান করে দেয়। এই চোঙার বদলে কেবল যদি দু'দিকে দুটো ফুটো থাকত তবে শব্দের জোর অনেক কম পাওয়া যেত।

এই চোঙা থেকে একটা পথ ভিতরে গিয়ে একখানা পাতলা চামড়ায় এসে শেষ হয়েছে। আমরা যখন কানটা ধুই, তখন এই পথটা পরিষ্কার করি না। ভালোই করি। পরিষ্কার করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে, ওই পাতলা চামড়াখানায় আঘাত লাগতে পারে। কিন্তু আমরা পথটা ধোয়াধুয়ি না করলেও ওটা আপনা হতে পরিষ্কার থাকে। এই নলের

চারদিকে সরু সরু গ্রন্থি আছে—ইংরেজিতে যাকে বলে গ্ল্যাণ্ড। সেই সব গ্রন্থি থেকে মোমের মতো জিনিস বের হয়, আর সেই জিনিস ভিতরকার ময়লা বের করে নিয়ে আসে। চলতি কথায় এটাকে আমরা কানের খোল বলি। এই পথটা শেষ হয়েছে যে-পাতলা চামড়ায়, সেটা খুব টানটান হয়ে আছে। বৈরাগিরা যে খঞ্জনি বাজায় জিনিসটা সেই ধরনের, তবে আকারে খুব ছোট আর সূক্ষ্ম। এক এক জন শিশুর অভ্যাস থাকে, কানের ভিতর কড়াই বা ওই রকমের জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া। যদি এ রকম কখন ঘটে তখনই ডাক্তার ডেকে সেটাকে বের করতে হবে, নিজেদের চেষ্টা না করাই ভাল। একটু ঘা লেগে যদি ওই পর্দাটা ছিঁড়ে যায়, তবে ওই শিশু কালা হয়ে তার ভবিষ্যৎ একেবারে মর্মান্তিক হবে।



চিত্র—15, কান

কানের বাইরের অংশ এইখানে শেষ হল। পর্দার পর আরম্ভ হল মাঝের অংশ। এই মাঝের কুঠুরিটি বায়ুতে ভরা। কিন্তু এ বায়ু আসছে কোথা থেকে? এই কুঠুরি থেকে একটা সরু নল এসে গলার নলের সঙ্গে মিশেছে। পর্দাটির দুপাশে চাপ সমান রাখবার জন্য এই দিক দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে, আবার দরকার হলে সেই বায়ু বের করে দেওয়া যায়। সাধারণত খাবার সময় আমরা এই কাজটা করি। দেখা গিয়েছে, বেশি সর্দি হলে আমরা কানে কম শুনি। ব্যাপারটা হল এই যে, ওই সরু নলটা তখন শ্লেষ্মায় বন্ধ হয়ে যায়, এদিক দিয়ে বায়ুর বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ

হল পর্দার ত্বদিকে চাপের সমতা রইল না, কাজেই পর্দাটা ঠিক মতো নড়াচড়া করে কাঁপতে পারল না।

এই মাঝের কুঠুরিতে তিনখানা ছোট ছোট হাড় আছে। আমাদের দেহে যতগুলি হাড় আছে, তার মধ্যে এরা সব চেয়ে ছোট। প্রথমটি দেখতে একটা হাতুড়ির মতো, এর হাতলটা আরম্ভ হয়েছে পর্দার গা থেকে। তার পরের হাড়টি নেয়াই-এর মতো, হাতুড়ির সঙ্গে ঠেকান। এর পর যে তৃতীয় হাড়টি আছে, সেটা একটা পাদানির মতো দেখতে। এই হাড় তিনখানি পর্দার কাঁপুনি বয়ে নিয়ে যায়, আর এদের চারদিকে বায়ু থাকে বলে এরা ঠিক রকম কাঁপতে পারে।

এই মাঝের কুঠুরিতে আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। এখানে ত্বটা পেশী আছে, যাদের কাজ একেবারে বিপরীত রকমের। আমরা ভাল করে শুনতে চাই, কান খাড়া করে রইলুম। ব্যাপারটা হল এই, একটা পেশী পর্দাটাকে খুব টান-টান করল, পর্দাটা ভাল রকমে কাঁপতে থাকল, শব্দের জোর বাড়ল। অন্য পেশীটা ওই পাদানির মতো হাড়টার সঙ্গে যুক্ত। তার কাজ একেবারে উল্টো। খুব একটা কর্কশ শব্দ হচ্ছে, এই পেশীটা ওই হাড়টাকে টেনে ধরল, ওটা ভাল রকম কাঁপতে পারল না, শব্দের জোর কমল। এই হাড় তিনখানা গায়ে-গায়ে আল্‌গা-আল্‌গা ভাবে ঠেকে আছে। এদের মধ্যে বাঁধন যদি কখন শক্ত হয়ে যায়, তাহলে তারা ভাল রকম নড়াচড়া করতে পারে না, কম্পন আর তেমন হয় না, শোনার ক্ষমতা কমে আসে। বয়স বেশি হলে কানের এই রকম অবস্থা অনেকের হয়।

পাদানির মতো হাড়টি আর একটি পর্দায় এসে ঠেকেছে, আর এখানে আরম্ভ হয়েছে কানের তৃতীয় কুঠুরি। এই কুঠুরিটি তরল পদার্থে ভরা। এর মধ্য দিয়ে ঢেউ কুঠুরির এদিক থেকে ওদিকে যায়। আমরা জানি, শব্দ বায়ুর ঢেউ তুলে আমাদের কানের পর্দা কাঁপায় ; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শেষ অবধি কানের ভিতরে চলে তরল পদার্থের ঢেউ।

এই তৃতীয় কুঠুরির গঠন বিচিত্র, একটা শামুকের খোলার মতো পথটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছে। এ দিকের পর্দাটা যখন কাঁপল, তখন তরল পদার্থে

যে ঢেউ উঠল, তা ওই পাক-খাওয়া পথ বেয়ে চলল। এই পথ ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে, আর সমস্ত নলটার আড়াআড়ি ভাবে কয়েক হাজার অতি সূক্ষ্ম তন্তু লাগান রয়েছে। পথটা ঘোরানো না হয়ে সোজা হলে আমাদের ছোট মাথাতে ওটা ধরত না, ঘোরালো হওয়ায় কম জায়গা নিয়েছে। নলটা ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে বলে তন্তুগুলি লম্বায় ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে। এই তন্তুগুলি আবার ছুদিকে কতকগুলি কোষের সঙ্গে লাগান, আর প্রত্যেক কোষ থেকে সরু চুলের মতো বেরিয়ে এসে ওই তরল পদার্থে ডুবে আছে। এরাই তরল পদার্থের ঢেউ বয়ে নিয়ে কোষ-গুলিতে পৌছে দেয়। এই সব কোষ থেকে নার্ভ চলে গিয়ে মস্তিষ্কে পৌছেছে।

একবার গোড়া থেকে দেখা যাক, কানে ঢোকা আর মরমে পশার মধ্যে কি কি ব্যাপার ঘটছে। বাইরে থেকে বায়ুর ঢেউ এসে কানের পাতলা পর্দাটাকে কাঁপাল। এই পর্দা থেকে পর-পর যে তিনখানা হাড় গিয়েছে, তারা কাঁপল ; শেষের হাড়টা আর একটা পর্দায় গিয়ে ঠেকেছে, ক্রমে সেটাও কাঁপল। এই পর্দার সামনে একটা নলে যে একরকম তরল পদার্থ আছে, তাতে ঢেউ উঠল। এই নলে কয়েক হাজার তন্তু আড়া-আড়ি ভাবে রয়েছে, আর চুলের চেয়েও সরু সরু কয়েক লক্ষ তন্তু এর মধ্যে ডুবে আছে। এরা যুক্ত আছে কতকগুলি কোষে, কোষ থেকে নার্ভ চলে গিয়েছে মস্তিষ্কে। সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে দেখে বিজ্ঞানী এই অবধি সঠিক খবর পেল। কিন্তু তার পরের ব্যাপারগুলিতে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি আর থৈ পেল না। কি করে ওই সব নার্ভ দিয়ে বিভিন্ন রকমের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছয়। একটা আর্কেস্ট্রোর সব কটা যন্ত্রের আওয়াজ কি করে এক সঙ্গে চলে গিয়ে মস্তিষ্ককে আলাদা আলাদা ভাবে জানান দেয়, ওর মধ্যে একটা বেসুরো হলে কি করে মস্তিষ্ক তা ঠিক ধরে ফেলে! এ-সব কথা চিন্তা করে বিজ্ঞানী অভিভূত হল ; শব্দের অনুভূতির সঠিক তথ্য তার কাছে রহস্য রয়ে গেল।

মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক আছে, সেখানে তো কোন ঈথরের ঢেউ কোন দিক দিয়ে পৌছয় না! মস্তিষ্ক তো চিরান্ধকারে রয়েছে, তবে কোথা থেকে আসছে মানুষের আলোর অনুভূতি! মস্তিষ্কে তো সরাসরি কোন বায়ুর

ঢেউ গিয়ে হাজির হয় না, তবে কি করে একটি বেহাগের তান আমাদের মনকে অভিভূত করে, দেহকে করে অবসন্ন!

এইসব ব্যাপার যখন আমরা ভেবে দেখি, তখন এই কথাটাই মনে জাগে, মানুষের ইন্দ্রিয় কি আশ্চর্যভাবে সুনিপুণ কৌশলে তৈরি।

শব্দের উৎপত্তি

পেটা ঘড়ি ঝুলছে, মাঝখানটায় মুগুরের ঘা দেওয়া হল, জোর শব্দ হতে থাকল। কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলে দেখব, ঘড়ির চাক্‌তিটা কাঁপছে। মৃদু স্পর্শ করলে ঘড়ির এ কাঁপুনি বোঝা যাবে। এখন ঘড়ির একটা ধার দু'টো আঙুল দিয়ে যদি জোরে চেপে ধরি, দেখব কাঁপুনি বন্ধ হল, সঙ্গে সঙ্গে শব্দও থামল! হাত থেকে কাঁসার বাটিটা পড়ে গিয়ে ঝন্‌ঝন করে উঠল, তাড়াতাড়ি গিয়ে বাটিটা চেপে ধরলুম, শব্দ থামল, কারণ ওটার কাঁপুনি বন্ধ হল। এস্‌রাজ, সেতার বাজছে, কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তারটা কাঁপছে। সব ক্ষেত্রেই জিনিসের কম্পন থেকে শব্দের উৎপত্তি। এখন কথা হচ্ছে, সব রকম কাঁপুনি কি শব্দের অনুভূতি জাগাবে?

মনে করা যাক, একটা জড়ানো স্প্রিং-এর এক দিকটা শক্ত করে ধরে অন্য দিকটা টেনে ছেড়ে দিলুম। স্প্রিংটা কাঁপতে থাকল। এর যাতায়াত চোখে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কই, কোন শব্দ তো শোনা যাচ্ছে না! স্প্রিংটা ছোট করা হল, অনেক ছোট করা হল। এখন স্প্রিং-এর যাওয়া-আসা চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এখন একটা শব্দ কানে আসছে। এ শব্দটা খুব ঢ্যাব্‌ঢেবে, নরম। স্প্রিং আরও ছোট করা হল। শব্দটা ক্রমশ তীক্ষ্ণ, চড়া হতে লাগল।

এর থেকে আমরা দেখছি যে, একটা জিনিসের কাঁপুনি থেকে শব্দের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু কাঁপুনির সংখ্যা একটা সীমায় না উঠলে সেই কাঁপুনি থেকে শব্দের অনুভূতি হয় না। এ সীমানাটা কোথায়?

পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কম্পন-সংখ্যা যদি সেকেণ্ডে তিরিশ বারের কম হয়, তবে সে কম্পন থেকে শব্দের অনুভূতি হবে না। কম্পন-সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া হল, শব্দটা মোটা ঢ্যাব্‌ঢেবে থেকে ক্রমশ মিহি হয়ে চলল।

কম্পন-সংখ্যা যখন সেকেণ্ডে 256-তে পৌঁছল, তখন সে-কম্পন আমাদের কানে 'সা' স্বরের অনুভূতি জাগাল। কম্পন-সংখ্যা আরও বাড়তে থাকল, স্বরের তীক্ষ্ণতাও বেড়ে চলল, শব্দ পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে লাগল। সন্ধ্যার সময় পাড়াগাঁয়ে যেসব ঝিঁঝিপোকা ডাকে, তাদের কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে দশ, পনর বা কুড়ি হাজার। কম্পন-সংখ্যা আরও বাড়ল, তীক্ষ্ণতাও বেড়ে চলল, কান আর সহ্য করতে পারে না। কিন্তু দাঁড়াও, আর বেশি সহ্য করতে হবে না। কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে যখন তিরিশ হাজার ছাড়াল, বস্, সে-কাঁপুনি আর আমাদের কোনরকম অনুভূতি জাগাল না, এর শব্দে আমাদের কান একেবারে বধির। মোটামুটি হিসাব এই, সেকেণ্ডে তিরিশের কম বা তিরিশ হাজারের বেশি কম্পন-সংখ্যা আমাদের কান ধরতে পারে না। কেউ কেউ অবশ্য অল্প এদিক-ওদিকের কম্পন-সংখ্যাও অনুভব করতে পারে।

আমাদের শোনা-ব্যাপারটা এই একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখনই হয়তো আমাদের কানের মধ্যে সেকেণ্ডে তিরিশ হাজারের বেশি কম্পন-সংখ্যার বায়ু ঢুকছে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমাদের কানে কোনরকম অনুভূতি জাগছে না।

আলোর বেলায়ও এই রকমের ব্যাপার ঘটে। সেখানে ঈথরের কম্পন আমাদের চোখে আলোর অনুভূতি জাগায়। কিন্তু সেখানেও কম্পন সংখ্যা যদি এদিকে-ওদিকে একটা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যায়, তবে আমরা ঈথরের কাঁপুনির মধ্যে বাস করেও একেবারে আঁধারে থেকে যাব, আলোর কোন অনুভূতি থাকবে না।

আমরা অনেক সময় তাল ঠুকে বলি,—'আমি নিজের কানে শুনেছি' 'নিজের চোখে দেখেছি'! হায় রে, আমার শোনার আর দেখাও ক্ষমতার দৌড় তো এই!

শব্দের বেগ

ধোপা পাটার উপর কাপড় আছড়াচ্ছে, আমি দূরে দাঁড়িয়ে। কাপড় পাটার উপর পড়ল দেখলুম, কিন্তু শব্দটা শুনলুম, তখনই নয়, একটু পরে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল দেখলুম, আওয়াজ এল তার কিছু পরে। এর থেকে বুঝা যায়, শব্দ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে কিছু সময়

নেয়। কিন্তু আলো কি নেয় না? আলোও সময় নেয় বটে, কিন্তু সে সময়টার হিসেব করলে দেখা যাবে, ওটা না নেওয়ারই সামিল। আলো যায় সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। সুতরাং ধোপার পাটা থেকে, মেঘ থেকে আমার চোখে আসতে আলোর যে সময়টুকু লাগে তা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

কিন্তু শব্দের বেগ কত? বায়ুর ঢেউ শব্দের অনুভূতি জাগাচ্ছে। সেই ঢেউ চলে সেকেণ্ডে প্রায় 1120 ফুট হিসেবে। (অবশ্য বায়ু গরম বা ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে এই বেগ অল্প কিছু বাড়ে-কমে, এক এক ডিগ্রীতে দু' ফুট হিসেবে)। এই বেগ সম্বন্ধে একটা ব্যাপার দেখা যায়। 'সা' স্বর বল,—রে' বল—স্বর কোমল হোক, চড়া হোক, জোর হোক,—বেগ একই। শূন্যে বা বায়ুতে আলোর বেগ সম্বন্ধে ওই একই কথা,—লাল আলো, নীল আলো. বেগনি আলো সবই, সব রকমের ঈথর-তরঙ্গ বায়ুতে ওই একই বেগে যায়,—সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। সূর্য থেকে যে তাপ আসছে, সেও ঈথরের আর এক রকমের ঢেউ, তারও ওই একই বেগ। ঈথরের অন্য রকমের ঢেউ এসে রেডিও চালায়, তারও বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

আলোর বেগ আর শব্দের বেগের মধ্যে তফাৎ কি ধরনের, তা একটা সোজা হিসেব থেকে বোঝা যাবে। ছোট একটা ঘর, মাত্র দশ ফুট লম্বা, ঘরের ওধারে বসে তুমি গান ধরলে। আমি ঘরের এধারে বসে আসি, আর আমার কাছে একটা রেডিও আছে। তুমি যখন গান ধরলে ঠিক সেই সময় লক্ষ্মৌ রেডিও-স্টেশনে একজন গান আরম্ভ করল। আমি রেডিওতে লক্ষ্মৌ-এর গানটা আগে শুনব, তোমারটা তারপর।

শব্দের বেগ মানুষ মাপল কি করে? কি করে জানল যে শব্দ সেকেণ্ডে 1120 ফুট যায়? হিসেব সোজা। ধরা যাক, একটা ফাঁকা জায়গায়, মনে করা যাক তিন মাইল দূরে, একটা কামান ছোঁড়া হল। আর এদিকে আমি একটা বিরাম-ঘড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে, আলো দেখবার ক সেকেণ্ড পরে কামানের গর্জন শুনলুম বিরাম-ঘড়িতে সেটা দেখলুম। তাহলে বস্তুতঃ তত সেকেণ্ডে শব্দ তিন মাইল পথ এসেছে। এর থেকে শব্দের বেগ পাওয়া গেল।

এতো হল সোজা ব্যাপার। কিন্তু যা মাত্র এক সেকেণ্ড এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল অতিক্রম করে বিজ্ঞান সেই আলোর বেগ পর্যন্ত মেপেছে, অনেক রকম উপায়ে মেপেছে, একেবারে নির্ভুল মেপেছে। কি করে? সে কথা এখন থাক, আলোর প্রসঙ্গে বলা যাবে।

প্রতিধ্বনি

আলোর রশ্মি একখানা আয়নার উপর পড়লে প্রতিফলিত হয়। শব্দেরও প্রতিফলন আছে। পাহাড়ের কাছে, বনের ধারে, মাঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করলুম—'ভূতো-ও'। কে যেন ভেঙচে জবাব দিলে,—'ভূতো-ও'। আসলে এটা ভ্যাঙচান নয়। বায়ুর ঢেউ আমার গলা থেকে গেল পাহাড়ে বা বনে, সেখানে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল আমার কাছে, আমারই কথা কিছু পরে আমি আবার শুনলুম। এই হল প্রতিধ্বনি।



চিত্র—16. প্রতিধ্বনি

এখানে একটা কথা আছে। যেখান থেকে প্রতিফলন হবে তা যদি একটু দূরে না থাকে, তবে প্রতিধ্বনি স্পষ্ট হবে না। না হবার কারণ এই, আমার ওই 'ভূতো-ও' শব্দ শেষ হবার আগেই যদি প্রতিধ্বনি

ফিরে আসে, তবে আসল কথা আর তার প্রতিধ্বনি মিশে এক হয়ে যাবে। হিসেবে দেখা গিয়েছে, এক মাত্রার একটা শব্দের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে হলে যেখান থেকে প্রতিফলন হবে, তা 112 ফুটের কাছে থাকলে চলবে না।

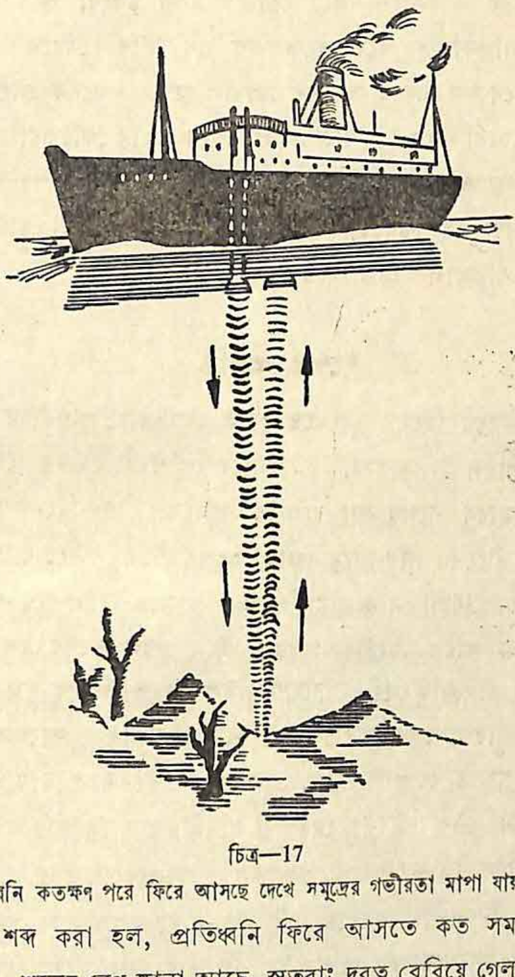
আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। শব্দ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার অনুভূতি চলে যায় না। বেশ কিছুক্ষণ থাকে, সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময় অবধি থাকে। আকাশে মেঘ রয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রয়েছে। একটা মেঘে বিদ্যুৎ চমকাল, বায়ুর ঢেউ মেঘের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসতে থাকল, একটা স্তর থেকে যে শব্দ আসছে তার রেশ চলে যেতে না যেতে আর একটা স্তর থেকে শব্দ এসে পৌঁছল, মেঘের গর্জন একটানা বলে মনে হল।

একটা হল ঘরে বক্তৃতা হচ্ছে। বক্তার কথা যদি ঘরের দেওয়ালগুলি থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, তবে সেই প্রতিধ্বনির জন্য শ্রোতারা ওই বক্তৃতা পরিষ্কার শুনতে পাবে না। কিন্তু এরকম তো প্রায় হয় না। না হবার কারণ হল এই। খোলা জানালার উপর যে ঢেউ পৌঁছল সে ঢেউ বাইরে চলে গেল, তার আর প্রতিফলন হল না। তারপর ঘরে আসবাবপত্র রয়েছে, দেওয়ালে ছবি রয়েছে, লোকজন রয়েছে, তারা সব অনেক ঢেউ শুষে নিল, প্রতিফলন হতে পারল না। তাই দেখা যায়, নতুন চুনকাম-করা খালি ঘরে যেমন প্রতিধ্বনি হয়, আসবাবপত্রপূর্ণ ঘরে সে রকম হয় না।

এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল পাশ্চাত্য দেশে এক পাড়াগাঁয়ের গির্জায়। সেই গির্জায় রবিবার রবিবার পাদ্রী যা বক্তৃতা দিতেন, তা বড়ই অস্পষ্ট হত। কিন্তু তাঁর বড়দিনের বক্তৃতা খুব পরিষ্কার বুঝা যেত। লোকে ভাবত এটা একটা দৈব ব্যাপার। আসলে ঘটনাটি ছিল এই। গির্জার হলটি বড় ছিল না, আসবাবপত্র ছিল খুবই কম, আর রবিবার দু'একজন মাত্র লোক উপস্থিত থাকত। সেই কারণে ওই সব দিন পাদ্রীর বক্তৃতার প্রতিধ্বনি হত খুব বেশি, আর দেওয়াল অনেকটা কাছে থাকায় কথা আর কথার প্রতিধ্বনি মিলেমিশি অস্পষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু বড়দিনের দিন অনেক টেবিল চেয়ার ভাড়া

করে আনা হত, ফুল-পাতা দিয়ে দেওয়াল সাজান হত, অনেক লোকজন উপস্থিত হত, সুতরাং সেদিন বক্তৃতার প্রতিধ্বনি প্রায় হতই না, কথাগুলি স্পষ্ট শুনা যেত।

প্রতিধ্বনি দিয়ে কুয়ার কত নিচে জল আছে, সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে গভীরতা কত, আমরা সহজে বের করতে পারি। আর কিছু



চিত্র—17

প্রতিধ্বনি কতক্ষণ পরে ফিরে আসছে দেখে সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়।

নয়, উপরে শব্দ করা হল, প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে কত সময় লাগে দেখা গেল। শব্দের বেগ জানা আছে, সুতরাং দূরত্ব বেরিয়ে গেল।

শব্দের প্রতিফলন সম্বন্ধে আরও কয়েকটা ব্যাপার দেখা যায়। আমরা যখন কথা বলি, তখন ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সুতরাং দূরে

যে লোক রয়েছে, তার কানে খুব কম সংখ্যক ঢেউ পৌছবে, আর সে যত দূরে যাবে এই সংখ্যা তত কমবে। শব্দের জোর বাড়াবার জন্য মানুষ কয়েক রকম ব্যবস্থা করল।

একটা চোঙা তৈরি করল, একদিকটা সরু অপর দিকটা মোটা হয়ে গিয়েছে। সরু দিকের মুখটা একটু চেপ্‌টা। এর সামনে কথা বললে ঢেউ-এর অধিকাংশ গিয়ে চোঙার মধ্যে ঢুকবে, আর চোঙাতে বারবার প্রতিফলিত হতে হতে অন্য মুখ দিয়ে বেরবে। সুতরাং ও-মুখ থেকে যে-শব্দ বেরবে তা বেশ জোরাল হবে। অনেক গ্রামোফোনে এই রকমের চোঙা থাকে। আজ কাল কোন কোন ফেরিওয়ালাও জোর আওয়াজের জন্য ওই ধরণের চোঙা ব্যবহার করে।

ডাক্তারেরা যে স্টিথস্কোপ ব্যবহার করেন, তার মধ্যে রোগীর বুকের স্পন্দনের বহু-প্রতিফলিত ঢেউ গিয়ে শব্দের জোর বাড়ায়।

শব্দের প্রকৃতি

মানুষ যতদূর হিসেব রেখেছে তাতে দেখা যায়, পৃথিবীতে সবচেয়ে জোর শব্দ হয়েছিল 27 আগস্ট, 1833 সালে। শব্দটা হয় যবদ্বীপের কাছে ক্রাকাটোয়া নামে দ্বীপের আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসে। ওই দিনের আগ্নেয়োচ্ছ্বাসে সমগ্র দ্বীপের প্রায় বারো আনা অংশ ছিটকে বেরিয়ে যায়। 300 গ্রাম নষ্ট হয়, 3600 লোক মারা পড়ে। হাজার মাইল দূরে এক শহরে সৈন্যেরা বন্দুক হাতে ছোটাছুটি করল, মনে করল তাদের দেশ আক্রমণ করতে শত্রুরা কামান ছুঁড়ছে। 3000 মাইল দূর অবধি ওই শব্দ ভালরকম শোনা যায়, আর সমুদ্রের জলে যে ঢেউ উঠে তা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপকূলে পৌছাল। বায়ুতে যে ঢেউ উঠল, তা সমস্ত পৃথিবী সাত বার ঘুরেছিল। বায়ুর ঢেউ-এ এরূপ আলোড়নের জন্য পৃথিবীর যেখানে যত ব্যারমিটার ছিল তার পারা উঠা-নামা করতে থাকল। হাজার হাজার মাইল দূরে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পারার এই উঠা-নামা লক্ষ্য করল, কিন্তু তা যে ক্রাকাটোয়ার আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের জন্য হল, তা তারা বুঝল কয়েক দিন পরে।

কাছে খুব জোর বজ্রপাত হলে সার্শির কাচ কাঁপতে থাকে। কামান-গর্জনেও ওই রকম হয়।

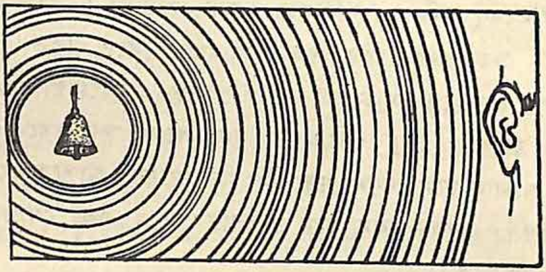
কাঁপুনির জন্য তো শব্দ। কাঁপুনির পরিসর যত বাড়ে, শব্দ তত জোরাল হয়। এ কারণ, কাঁপুনির পরিসর বড় হলে বায়ুর দোলনের পরিসরও বড় হবে, ফলে কানের পর্দার নড়াচড়ার পরিসরও বাড়বে, শব্দ জোর বলে মনে হবে।

পেটা ঘড়িতে একটা জোর ঘা মেরে ছেড়ে দিলুম। জিনিসটা কাঁপতে থাকল, দোলনের পরিসর বেশি হল, শব্দের জোর হল। কিন্তু দোলনের পরিসর ক্রমে ক্রমে কমতে রইল, শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকল। আবার ধরা যাক, পূজার মণ্ডপে চড়্ চড় করে ঢাক বাজছে। কাছে দাঁড়িয়ে আছি, কান ফেটে যাচ্ছে। পিছু হঠতে থাকলুম, শব্দের জোর কমতে থাকল। আধ মাইল আন্দাজ চলে গেলুম, শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে একেবারে মিলিয়ে গেল। এরকম কেন হবে দেখবার আগে একটা গোড়ার কথা আলোচনা করা যাক।

ঢাকের চামড়ায় কাঠি দেওয়ায় চামড়া কাঁপতে লাগল, এটা বোঝা গেল। অন্যদিকে আমার কানের পর্দা কাঁপায়, শব্দের অনুভূতি হয়, এও জেনেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, গাজন-তলায় ঢাকের চামড়া কাঁপায় অশথ-তলায় আমার কানের চামড়া কাঁপে কি করে? মাঝে কিছু হচ্ছে নিশ্চয়, কিন্তু সেটা কি?

ঢাকের চামড়া কাঁপছে। কাঁপছে মানে একবার এগোচ্ছে, পরমুহূর্তে পিছচ্ছে। যখন এগোচ্ছে তখন সামনের বায়ুস্তরকে ঠেলছে, চাপে বায়ুস্তর সংকুচিত হচ্ছে। আবার যখন পিছচ্ছে, বায়ুস্তর আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে। চাপটা স্তর হতে স্তরে এগিয়ে চলল, আবার আল্‌গা হওয়াটা তার পিছু নিল। ফলে বায়ুর ঢেউ ক্রমাগত ছুটল, ছুটে শেষ অবধি আমার কানে পৌঁছল, কানের পর্দাকে কাঁপাতে থাকল। ওই ঢাক থেকে আমার কান অবধি প্রতি বায়ুকণা কাঁপছে, অর্থাৎ এগোচ্ছে-পিছচ্ছে, আর এই রকম করে ঢেউ এগিয়ে চলেছে। কাছে একটা ঘণ্টা বাজছে। আমি শব্দ শুনছি। ব্যাপারটা খুবই সোজা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মাঝখানের বায়ুতে কি-যে কাণ্ড ঘটছে, তা পরের পৃষ্ঠার 18 নং ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে। বায়ুকণা কোথাও খুব ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে, আবার পাশেই হয়ে গেছে খুব ফাঁক-ফাঁক। পরমুহূর্তে ব্যাপারটা সব উল্টে গেল।

এই রকম চলতে রইল। কিন্তু একটা কথা আছে। ঢেউ যত এগিয়ে চলেছে, বায়ুকণার নড়াচড়ার পরিসর তত কমে আসছে। ফল হচ্ছে এই, আমি ওই ঢাক থেকে খুব দূরে গিয়ে দাঁড়াই, তবে অত দূরে বায়ুকণার নড়াচড়াটা এতই ক্ষীণ হয়ে আসবে যে, কানের চামড়াকে ওই ক্ষীণ ঢেউ আর দোলাতে পারবে না, আমার শব্দের অনুভূতি হবে না।



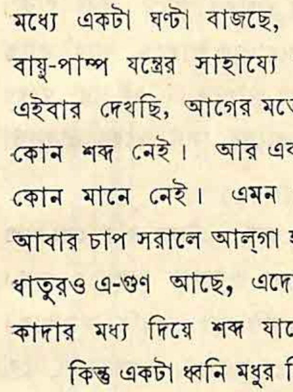
চিত্র—18.ঘণ্টা বাজা শুনছি—মাঝে বায়ুর অবস্থা

এই ঢেউ-চলা কথাটায় একটা ভুল ধারণা না জন্মায়। ঢেউ ছুটেছে মানে এ নয় যে বায়ুকণা ছুটছে। 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে' – এখানে কি ধানের শীষ বন্‌বন করে ছুটে চলেছে ? তা নয়। ধানের শীষ অল্প পরিসর স্থানে যাওয়া-আসা করছে, এগিয়ে যাচ্ছে ঢেউ, অর্থাৎ স্থানেই তার নড়া-চড়ার ব্যাপার। পুকুরে একটা ঢিল ফেললুম, জলে ঢেউ উঠল, ঢেউ পাড়ের দিকে ছুটল। লক্ষ্য করলে দেখব, জলের কণা ছুটে যাচ্ছে না, কালো জল তালে তালে এক জায়গাতেই নাচছে। একটা সোলার ছিপি ভাসিয়ে দিলে দেখব, ছিপিটা ছুটছে না, এক জায়গায় উঠা-নামা করছে। বায়ুকণার কাঁপা আর এই জলকণার কাঁপার মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে, বায়ুকণা কাঁপছে সামনে-পিছনে, আর জলকণা নড়ছে উপর-নিচে। আলো যে-ঈথরের কম্পন, সে-ঈথর কাঁপে জলকণার মতো, – উপর-নিচে।

ঢাক থেকে আমি দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে, জোর শব্দ হচ্ছে। ঢাক থেকে কুড়ি হাত দূরে যদি দাঁড়াই, অর্থাৎ দূরত্ব যদি দু' গুণ হয়, তবে শব্দের জোর সিকি হয়ে যাবে, দূরত্ব তিনগুণ হলে শব্দের জোর ন-ভাগের একভাগে গিয়ে দাঁড়াবে। আলোর বেলায়ও ঠিক এই রকম হয়।

যে-জিনিস কাঁপছে, তার কাঁপুনি একস্তর থেকে পরবর্তী স্তরে, তার পরবর্তী স্তরে, তার পরবর্তী স্তরে, এই রকম করে এগিয়ে চলল, শেষ অবধি কানের পর্দা দুলল। আচ্ছা, মাঝে বায়ু যদি না থাকে তো কি হবে? ঢেউ এগোতে পারবে না, কানের পর্দা দুলবে না, সুতরাং কিছুই শোনা যাবে না। পরীক্ষায় ব্যাপারটা সহজে দেখান যায়। একটা বড় কাচের গোলকের মধ্যে একটা ঘণ্টা বাজছে, বাইরে থেকে শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে। এখন বায়ু-পাম্প যন্ত্রের সাহায্যে ওই গোলক থেকে বায়ু বের করে নেওয়া হল। এইবার দেখছি, আগের মতো ডাণ্ডাটা বাটির গায়ে ঘা মেরে চলেছে, কিন্তু কোন শব্দ নেই। আর একটা কথা। মাঝে যে বায়ু থাকতেই হবে তার কোন মানে নেই। এমন জিনিস থাকলেই হল যা চাপে সংকুচিত হয়, আবার চাপ সরালে আল্‌গা হয়। জলের এ গুণ আছে, লোহা ও অন্যান্য ধাতুরও এ-গুণ আছে, এদের মধ্যে দিয়ে শব্দ যায়। কাদার এ গুণ নেই, কাদার মধ্য দিয়ে শব্দ যাবে না।

কিন্তু একটা ধ্বনি মধুর কি কর্কশ, সেটা ওই ধ্বনি জোর হচ্ছে কি আস্তে হচ্ছে, তার উপর ততটা নির্ভর করে না। ঢাকের বাদ্যি খুব জোরাল বলে না হয় ওটা থামলেই মিষ্টি লাগে, কিন্তু মশার গুঞ্জন-ধ্বনি তো কানে মধু ঢালে না, আর সে তো খুবই মৃদু। খুব দূর থেকে শুনতে পাওয়াটা শব্দের প্রধান গুণ নয়। শব্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, জিনিসটা তাড়াতাড়ি কাঁপছে, কি ধীরে ধীরে কাঁপছে। একটা তার-কে কাঁপান হল। ওই তার সেকেণ্ডে যতবার কাঁপবে, সেকেণ্ডে ততগুলি ঢেউ ছুটবে, আর আমাদের কানের পর্দা, সেকেণ্ডে ততবার দুলবে। একটা স্বর মিহি কি মোটা, তা এই কাঁপুনির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। স্বরের সুরত্ব হল এই কাঁপুনির সংখ্যা; স্বর জোরাল কি মৃদু, সেটা আবার অন্য কথা।



চিত্র—19
গোলক থেকে বায়ু বের করে নেওয়া হয়েছে। শব্দ শোনা যাবে না

'সা স্বর শুনছি, বায়ু সেকেণ্ডে 256 বার কাঁপছে। 'রে'-তে এলুম,

কম্পনসংখ্যা হল সেকেণ্ডে 288। বেড়ে বেড়ে চলল, উঁচুস্কেলের 'সা'-তে যখন পৌছলুম, তখন কাঁপুনির সংখ্যা হল সেকেণ্ডে 512।

আমরা দেখেছি, শব্দ জোর কি মৃদু, অর্থাৎ শব্দের প্রবলতা নির্ভর করছে কাঁপুনির পরিসরের উপর। আর শব্দ চড়া কি নরম, তারা কি উদারা, অর্থাৎ শব্দের তীক্ষ্ণতা, নির্ভর করছে সেকেণ্ডে কতবার ওই জিনিসটা কাঁপছে তার উপর। কথাটা আর একদিক দিয়ে দেখা যাক। খুব দূরে একটা হারমোনিয়ম থেকে খুব ক্ষীণ 'রে' স্বর আসছে, আর কাছে আর একটা হারমোনিয়ম থেকে জোর 'সা' স্বর আসছে। ওই 'রে' স্বরের তীক্ষ্ণতা বেশি, কিন্তু প্রবলতা কম! আর কাছের 'সা' স্বরের প্রবলতা বেশী, তীক্ষ্ণতা কম হবে।

আলোতে অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। ঈথর যদি সেকেণ্ডে 4-কোটি বার কাঁপে, তবে সেই কম্পন লাল আলোর অনুভূতি দেয়। সেকেণ্ডে 8-কোটি বার কাঁপলে তার অনুভূতি হয় বেগনি আলোর। আলোর লাল, হলদে, সবুজ, নীলের পার্থক্য যে-জাতের, শব্দের সা, রে, গা, মা—র তফাৎ সেই জাতেরই। আলোতে বিভিন্ন রং হল ঈথর-কম্পন-সংখ্যার বিভিন্নতা, আর শব্দে সা, রে, গা, মা হল বায়ুস্পন্দনের পার্থক্য।

কিন্তু আর একটা কথা রয়ে গেল। মনে করা যাক্, পাশের ঘরে একটা হার্মোনিয়মে 'সা' বাজছে, আর একটা বেহালাতেও 'সা' বাজছে। যন্ত্র দুটি আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু শব্দ শুনে তো ঠিক ধরতে পারছি কোন স্বরটা হারমোনিয়ম থেকে, আর কোনটা বেহালা থেকে আসছে। স্বর দুটির প্রত্যেকেরই তীক্ষ্ণতা 256, আর দুটিই সমান জোরের। তবে এ-পার্থক্যের বোধ আসছে কোথা থেকে?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। হারমোনিয়ম থেকে যে 256-তীক্ষ্ণতার স্বর বেরচ্ছে, সেটা খাঁটি 256 নয়। 256 প্রধান ও প্রবল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে আরও অনেকগুলি স্বর, সেগুলির তীক্ষ্ণতা ওই 256-এর দু গুণ, তিন গুণ, চার গুণ বা তারও বেশি। আবার বেহালারও 256-এর সঙ্গে বিভিন্ন উচ্চ তীক্ষ্ণতার স্বর মিশিয়ে রয়েছে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রে মেশান স্বরগুলি ঠিক যদি একই হত, আর একই পরিমাণে থাকত, তবে তফাৎ বোঝা যেত না। কিন্তু তা নেই।

তাই 256 দু'টারই প্রধান স্বর হলেও স্বর দু'টা হুবহু এক হল না, প্রত্যেকেরই একটা বৈশিষ্ট্য রইল।

একটি মাত্র যন্ত্র আছে, যার থেকে বিশুদ্ধ এক রকমের স্বর বেরয়, অন্য স্বর মেশান থাকে না,—সে হল টিউনিং-ফর্ক। তাই বিজ্ঞানী শব্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষায় টিউনিং-ফর্ক ব্যবহার করে থাকেন।

একটা ব্যাপারে কানের জিত, চোখের হার। লাল আলো চোখে এক রকমের অনুভূতি জাগায়, নীল আলো আর এক রকমের অনুভূতি দেয়। কিন্তু চোখ লাল আলো আর নীল আলো যদি একত্রে দেখে, তবে সে অনুভূতিটা হবে না-লালের না-নীলের, হবে অন্য একরকমের। চোখ অনুভূতি দুটোকে তফাৎ করতে পারবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য ক্ষমতা কানের,—সা, রে, গা, মা, যত ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন স্বর একসঙ্গে বাজাও, কান প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে সঠিকভাবে ধরে ফেলবে।



চিত্র—20
টিউনিং-ফর্ক

অবশ্য একটা কথা থাকবে। স্বর দুটির তীক্ষ্ণতা যদি খুব কাছাকাছি হয়, পার্থক্য যদি আট-এর কম হয়, তবে ওদের কোনটারই পৃথক অনুভূতি হয় না, শব্দের জোরেরই হ্রাসবৃদ্ধি হয় মাত্র, একটা গোঁ-ও গোঁ-ও আওয়াজ হতে থাকে। একে বলা হয় স্বরকম্প, ইংরেজিতে বলে,—'বিট'। তীক্ষ্ণতার পার্থক্য যদি হয় দুই, সেকেণ্ডে দু'বার স্বরকম্প হবে, পার্থক্য হয় যদি ছয়, সেকেণ্ডে ছ'বার গোঁ-ও গোঁ-ও শব্দ হবে, পার্থক্য যদি দশ হয়, আর স্বরকম্প হবে না, স্বর-দু'টি পৃথক হয়ে যাবে।

সংগীত

কোকিলের কুহুধ্বনি, সেতারের গুঞ্জন প্রীতিকর। কিন্তু কামানের গর্জন, হাতুড়ির ঘা, শুকনো পাতার খস্‌খসানি পীড়াদায়ক। এ দু'রকম অনুভূতির পার্থক্য আসছে কোথা থেকে?

বায়ুর যে ঢেউ কানের পর্দাকে দোলায় তা যদি নিয়মিত হয়, আর

তার মধ্যে যদি ধারাবাহিকতা থাকে, তবে সেটা সুস্বর বলে মনে হবে। এর অভাব হল কলরব, আর তা কর্কশ।

এই 'নিয়মিত' আর 'ধারাবাহিকতা' কথাদু'টি বুঝে দেখা যাক। ধরা যাক্, দু' মিনিট ধরে একটা শব্দ চলেছে, আর তার তীক্ষ্ণতা হল সেকেণ্ডে 256। এখন এই দু মিনিট কালের মধ্যে প্রতি-সেকেণ্ডে যদি দেখি যে কম্পনসংখ্যা 256 রয়েছে, তার কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না, তাহলে ওই শব্দ হল নিয়মিত। আর যদি দেখি, কোন এক সেকেণ্ডে তীক্ষ্ণতা 256 আর এক সেকেণ্ডে 400, অন্য এক সেকেণ্ডে 40, আবার 256 হল; এই রকম চলল, কোন স্থিরতা নেই, তাহলে সে ঢেউ নিয়মিত হল না। তারপর যদি দেখি ঢেউ-এর মধ্যে কোন বিরতি নেই, এগোন-পিছন, যাওয়া-আসা ঠিক পর পর চলেছে, হঠাৎ একবার বেশি এগলো না, হঠাৎ কখন বেশি পিছল না, তাহলে সেই ঢেউ-এর ধারাবাহিকতা আছে বলা যায়।

শব্দবিদ্যায় আমরা সুস্বরই আলোচনা করি।

দু'টি স্বর আসছে, প্রত্যেকটি সুস্বর। কিন্তু দু'টি একসঙ্গে বা পর-পর কানে এলে যে অনুভূতি মধুর হবে, তা বলা যায় না। ওই স্বর দু'টির মধ্যে যদি একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে, তবেই অনুভূতি সুখপ্রদ হবে, আর সে অনুপাতগুলি হল—

2 : 1, 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 6 : 5, 9 : 8, 10 : 9, 16 : 15

এই অনুপাতগুলি বজায় রেখে সংগীতজ্ঞ সাতটি স্বর নিয়ে একটা স্বরগ্রাম তৈরি করলেন। এই সাতটি স্বর হল—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। সংক্ষেপে তাদের বলা হয়,—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি,। নি-র পর আরম্ভ হল যথাক্রমে ওদের অষ্টক। এই রকম চলল।

সা ও রে-র মধ্যে অনুপাত রাখা হল			8 : 9
রে ও গা-র মধ্যে	”	”	9 : 10
গা ও মা-র মধ্যে	”	”	15 : 16
মা ও পা-র মধ্যে	”	”	8 : 9

পা ও ধা-র মধ্যে অনুপাত রাখা হল	9 : 10
ধা ও নি-র মধ্যে „ „	8 : 9
নি ও অষ্টক সা (র্সা)„ „	15 : 16

সা-র সঙ্গে তুলনায় রে প্রভৃতি পর-পর স্বরগুলির অনুপাত রইল যথাক্রমে—

$$\frac{9}{8}, \frac{5}{4}, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{15}{8}, \text{ ও } 2$$

এখন দেখা যায়, দু'টি স্বরের অনুপাত যদি দু'টি নিম্ন সংখ্যার পূর্ণ-রাশি হয়, তবে স্বরদুটি সুশ্রাব্য হবে। আগের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সা ও মা-র অনুপাত 2 : 3, সা ও গা-র অনুপাত 3 : 4। এরা সুশ্রাব্য। কিন্তু সা ও নি-র অনুপাত 8 : 15। এটা সুখশ্রাব্য নয়।

পূর্ণসংখ্যার সা থেকে তার অষ্টক সা´ পর্যন্ত আটটি স্বরের অনুপাত হবে যথাক্রমে—

24 : 27 : 30 : 32 : 36 : 40 : 45 : 48

সংগীতে 256-কে সা ধরা হয়। সেই হিসাবে রে, গা, প্রভৃতির তীক্ষ্ণতা হল—

সা—256, রে—288, গা—320, মা—341, পা—384, ধা—427, নি—480, র্সা—512

সংগীতজ্ঞ এই কটি স্বর, আর তাদের অষ্টক নিয়ে সুখশ্রাব্য সংগীত সৃষ্টি করলেন।

কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। 256-কে যে সব সময় প্রাথমিক স্বর ধরে চলতে হবে, তার মানে নেই। মনে করা যাক, আমরা 288-কে, ওই স্বরগ্রামের রে-কে সা ধরলুম, আর তাই ধরে একটা স্বরগ্রাম তৈরি করলুম। কিন্তু যেটাকেই সা ধরি না কেন, পর-পর অনুপাত ঠিক রেখে যেতে হবে, তা না হলে সংগীত হবে না। অর্থাৎ এই নতুন স্বরগ্রামে সা যখন হচ্ছে 288, তখন রে হবে $288 \times \frac{9}{8} = 324$। এই রকম হিসাবে গা—360, মা—384, পা—432, ধা—480, নি—540, সা´—576।

আগের 256, 288, 320 প্রভৃতি তীক্ষ্ণতার স্বর দিয়ে একটা বাক্স তৈরি করে নিলুম, যার এক একটা চাবি টিপলে ওই এক একটা স্বর বেরয়।

এখন 288-কে সা ধরে একজন গাইতে আরম্ভ করল। এর রে হবে 324। কিন্তু 324 আমাদের বাক্সয় পেলুম না, কাছাকাছি আছে বটে 320, আগের স্কেলের গা। এইবার গা—360, কাছাকাছিও কিছু মিলল না। এর পর এল মা—384, ওর পা-র সঙ্গে ঠিক মিলে গেল। এখন পা—432, কাছাকাছি রইল ওর ধা--427। এবার ধা—580, ওর নি-র সঙ্গে ঠিক মিলে গেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওই বাক্স দিয়ে শুধু 256-কে সা ধরলে গাওয়া চলবে, উঁচুতে সা ধরলে ও-বাক্স কাজে আসবে না।

সংগীতজ্ঞ এ সমস্যার কতকটা সমাধান করলেন। প্রথম স্বরগ্রামে 256 সা, আর তার অষ্টক র্সা-এর মধ্যে 6-টি স্বর ছিল। সংগীতজ্ঞ এখন ওতে আর 5-টি স্বর যোগ করলেন। মোটের উপর মাঝে 11-টি স্বর এল, আর এই নতুন স্বরগ্রামের সব জায়গায় পর-পর অনুপাত এক রকমের রইল। সেই অনুপাত হল $2^{\frac{1}{12}}$ প্রায় 1·05946। 256-কে পর-পর $2^{\frac{1}{12}}$ দিয়ে গুণ করে গিয়ে আমাদের এই নতুন স্বরগ্রাম দাঁড়াল—

সা—256, রে (কোমল)—271, রে—287, গা (কোমল)—304, গা—322, মা—342, মা (কড়ি)—362, পা—383, ধা (কোমল)—405, ধা—430, নি (কোমল)—456, নি—483, সা´—512।

এই রকম স্বরগ্রামের একটা মস্ত সুবিধা হল এই যে, যে-কোন স্বরকে সা ধরলে তার রে, গা, মা, প্রভৃতি সব এই স্বরগ্রামের মধ্যে পাওয়া যাবে। তবুও কিছু গণ্ডগোল রয়ে গেল।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মূল স্বরগ্রাম রে-কে সা ধরলুন। প্রথমত, বাক্সে ঠিক 288 নেই, কাছাকাছি 287 আছে, অগত্যা তাই নিলুম। এর রে হবে 324। কিন্তু বাক্সে ঠিক 324 নেই, কাছাকাছি আছে 322, ওকেই রে ধরতে হল, সুতরাং একটু গোঁজামিল দিতে হল। গা হবে 360। কিন্তু 360 নেই, আছে 362। মা হবে 384, আছে 383। পা 432, আছে 430। ধা 480, কাছাকাছি 483 আছে। এই রকম চলল, একেবারে বিশুদ্ধ স্বর পাওয়া গেল না। হারমোনিয়ম, পিয়ানো, এই রকম স্বরগ্রামযুক্ত যন্ত্র। কাজে কাজেই এইসব যন্ত্র একেবারে বিশুদ্ধ সুর দিতে পারে না। হারমোনিয়মের তিনটি পূর্ণ-গ্রাম থাকে, পিয়োনোতে থাকে সাতটি পূর্ণ-গ্রাম।

মোটামুটি ব্যাপারে এইসব যন্ত্র খুব সুবিধাজনক। তবে যেখানে সূক্ষ্ম সুরের কারবার, সেখানে এসব চলবে না। তাই ওস্তাদ যদি বলে, 'আমার 360-ই চাই, 362 হলে হবে না, ফেলে দাও তোমার হারমোনিয়ম'—তা হলে তাকে অগ্রাহ্য করা চলবে না, ওই গুণীকে প্রণতি জানিয়ে তার হাতে একটি তারের যন্ত্র দিতে হবে। তার-এ ইচ্ছামতো মোচড় দিয়ে, আর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে কমিয়ে সে ওই 360-ই বের করবে, কোনরকম আপোস করে চলবে না।

বাদ্যযন্ত্র

একটা তারকে কাঁপান হচ্ছে। তার ছোট হলে ওর থেকে যে-স্বর বেরবে, তা হবে চড়া; তার বড় হলে স্বর হবে কোমল। আবার তারের টান বাড়িয়ে-কমিয়ে স্বরের তীক্ষ্ণতা বাড়ান-কমান যায়। একই ধাতুর তারের সরু-মোটা ভেদেও তীক্ষ্ণতা বাড়ে কমে।

সেতার, এস্‌রাজের গায়ে তারের নীচে, স্থানে স্থানে কতকগুলি লোহা বা পিতলের ফলক লাগান থাকে। তারটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বাজাবার জন্য এই ব্যবস্থা। ওস্তাদ তারটিতে যথাযথ স্থানে আঙুল দিয়ে তারটিকে ছোট-বড় করেন, আর তাকে কাঁপান। কোন্ স্থানে আঙুল দিয়ে বাজালে কি স্বর বেরবে, তা ওস্তাদের ভাল রকম জানা আছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি আঙুল চালিয়ে তিনি ওই-সব যন্ত্র থেকে নানা স্বর বের করেন, আর তাদের বিন্যাসে অপূর্ব সংগীত সৃষ্টি করেন। কয়েক রকম বাদ্যযন্ত্রের কথা বলা যাচ্ছে।

বেণুযন্ত্র অনেক প্রকারের আছে,—বাঁশি ক্লারিওনেট, বিউগল, ফ্লুট, অর্গান-পাইপ ইত্যাদি। শব্দ বের করবার জন্য প্রত্যেকটিতে একটা করে রিড থাকা চাই। ফুঁ দিলে, বা অন্যরকমে বায়ু চালনা করলে রিডটা কাঁপতে থাকে, তখন শব্দের উৎপত্তি হয়। এক রকমের রিড আমাদের বেশ চেনা। ছেলে বেলায় আমের আঁটিকে যখন ভেঁপু করতে হয়েছে। তখন ফুঁ দিলে ওটা কাঁপতে থাকে, শব্দ বেরয়। সস্তার টিনের বাঁশি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাতে একটা পিতলের পাত লাগান আছে, ফুঁ দিলে সেটা কাঁপে। ওটা হল ওই বাঁশির রিড। একটা হারমোনিয় খুললে দেখা যাবে তাতে অনেকগুলি রিড লাগান

আছে। হাপর থেকে বাতাস এসে রিডকে কাঁপায়, স্বর বের হয়। বেণুযন্ত্রের দীর্ঘতা অনুসারে স্বরের তীক্ষ্ণতা কমে-বাড়ে। ক্লারিওনেট বা বাঁশি যত লম্বা হয়, স্বর হয় তত কোমল, ছোট হলে স্বর চড়া হয়।

ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, বাঁয়া, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রে চামড়াকে কাঁপিয়ে শব্দ বের করা হয়। এ-সব যন্ত্রের সাধারণ নিয়ম হল এই, চামড়া যত ছোট হবে, স্বরের তীক্ষ্ণতা তত বাড়বে। আর চামড়ার উপর টান বাড়ালেও স্বরের তীক্ষ্ণতা বেড়ে যাবে। চামড়া থেকে কতকগুলি দড়ি-দড়া এসে যন্ত্রের খোলের সঙ্গে লাগান থাকে, এগুলিকে টান দিলে চামড়ার উপর টান বাড়ে।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। সেতারে, তানপুরায়, শরদে, যন্ত্রের গায়ে এক একটা খোল থাকে, সাধারণত লাউ-এর। ঢাকে, ঢোলে কাঠের খোলগুলো খুব বড়। এসব খোল রাখা হয় কেন ? শোভা বাড়াবার জন্য কি ? তা নয়। এদের কাজ আছে।

মনে করা যাক, একটা জিনিস কাঁপছে, আর তার থেকে একটা শব্দ বেরুচ্ছে। এই স্বরের কম্পনসংখ্যা নির্ভর করবে ওই জিনিসটার ওজনের উপর, ওর আকৃতির উপর, আর জিনিসটা কিসে তৈরী তার উপর। এই তীক্ষ্ণতা হল ওই জিনিসের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা।

এখন দু'টো জিনিসের স্বাভাবিক স্পন্দন যদি এক হয়, তবে প্রথমটা বাজলে দ্বিতীয়টাও বাজতে থাকবে, অবশ্য জিনিস দু'টো যদি কাছাকাছি থাকে। একে বলে অনুনাদ, ইংরেজিতে বলা হয় রেসোনান্স। একটা উদাহরণ লওয়া যাক। একটা নলের এক মুখ খোলা, অপর মুখ বন্ধ। খোলা মুখের সামনে একটা টিউনিং- ফর্ক ধরা হল, টিউনিং-ফর্কটা বাজছে। এখন নলের ভিতরকার বায়ুর একটা স্বাভাবিক স্পন্দন আছে। সেই স্পন্দন যদি টিউনিং ফর্কের স্পন্দনের সঙ্গে মিলে যায়, তখন নল গোঁ গোঁ করে শব্দ করতে থাকবে, না মিললে নল কোন শব্দ করবে না।

কিন্তু ধরা যাক, 256 তীক্ষ্ণতার একটা টিউনিং-ফর্ক একটা ছোট টুলের গায়ে চেপে ধরলুম, টুলটা গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকবে। একটা বড় টেবিলের গায়ে চেপে ধরলুম, টেবিলটাও জোর শব্দ করতে থাকবে। টুলের কাঠের স্বাভাবিক স্পন্দন একরকম, টেবিলের কাঠের আর

একরকম। কিন্তু ওই টিউনিং-ফর্ক প্রত্যেককেই তার নিজের তালে বাজতে বাধ্য করবে, তাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক তাল যাই হোক। এই অস্বাভাবিক স্পন্দন তোলা যায় কঠিন পদার্থে। গ্যাসীয় পদার্থে স্বাভাবিক স্পন্দন মিলে গেলে তবেই সে সাড়া দেবে। যে-যন্ত্রগুলির কথা আগে বলা হয়েছে, তাদের পিছনে যে একটা করে খোল লাগান থাকে, তাদের কাজ হচ্ছে এই, যেগুলি একতালে শব্দ করে মোট শব্দের জোর বাড়িয়ে দেবে। খঞ্জনির আওয়াজের চেয়ে ঢাকের আওয়াজ যে জোরাল হয় তার কারণ, ঢাকের প্রকাণ্ড খোল ঢাকের চামড়ার সঙ্গে একতালে কেঁপে শব্দটাকে খুব জোরাল করে দেয়। খোলের নিজের বোল যাই থাক, টানা চামড়ার বোলেই তার বোল। সেতারের তারের তীক্ষ্ণতা যদি 256 হয়, তবে খোলও ওই তীক্ষ্ণতায় বাজতে থাকবে। আবার পর মুহূর্তে তারের তীক্ষ্ণতা যেই 480-তে উঠল, খোলের স্পন্দনও ওই 480-তে উঠে যাবে।

কাঁসি, পেটা ঘড়ি, ঘণ্টা প্রভৃতিতে ঘা দিলে অনেক রকমের স্বর বেরয়। এ-সব ক্ষেত্রে জিনিসটার আয়তন যত ছোট হয় স্বর তত চড়া হয়, তবে তার জোর কমে। ঘা দিলে জিনিসটা সমগ্রভাবে কাঁপে, আবার ভাগ-ভাগ হয়েও কাঁপে। কাজে কাজেই অনেকগুলি স্বর বেরয়, আর সেগুলি এলোমেলো হওয়ায় শব্দটা শ্রুতিকটু হয়। ভাগ-ভাগ থেকে যে শব্দ বেরয়, তা বেশিক্ষণ থাকে না। সমগ্রটা থেকে যে-শব্দ বেরয়, শেষ পর্যন্ত সেইটা থেকে যায়, আর তা শ্রুতিকটু নয়।

এইবার একটা শব্দকারী যন্ত্রের কথা বলব, যা দাম দিয়ে কিনতে হয় না। সেটা হল আমাদের বাগ্‌যন্ত্র।

আমাদের বুকের মধ্যে যে ফুস্‌ফুস আছে, তার থেকে বায়ু বেরয়। এই বায়ু কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে বেগে চলে বাগ্‌যন্ত্রে গিয়ে ঢোকে। এখানে দু'টি পাতলা চামড়া আছে, বায়ু এসে তাদের কাঁপায়। এরা রিডের কাজ করে। কিন্তু এতে কাঁপুনির তেমন জোর হল না। এর তালে তালে মুখের ভিতরকার বায়ুও কাঁপতে থাকে, শব্দ জোরাল হয়।

সাধারণত দেখা যায়, পুরুষদের গলার স্বর অপেক্ষা মেয়েদের গলার স্বর বেশি তীক্ষ্ণ হয়। মানুষের গলার মধ্যে দুটো টান টান পর্দা আছে

অনেকটা হারমোনিয়মের রিডের মতো। এই পর্দা দুটোর মধ্যে দিয়ে বায়ু চালিয়ে আমরা শব্দ বের করি। পর্দার টান, আর পথের ব্যবধান বাড়িয়ে-কমিয়ে আমরা শব্দের তীক্ষ্ণতা বাড়াই কমাই। পরীক্ষায় দেখা গেছে, পুরুষের বাগ্‌যন্ত্রে এই পর্দা যতটা লম্বা থাকে, মেয়েদের বাগ্‌যন্ত্রে ওই পর্দা তার চেয়ে ছোট। পর্দা যত লম্বা হয়, স্বরের তীক্ষ্ণতা তত কমে। এটা হল স্বাভাবিক অবস্থা। তবে বায়ুপথের খাঁজ ইচ্ছামতো বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা গলা থেকে মোটা বা মিহি স্বর বের করতে পারি।

গলা থেকে আমরা যে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করি, তার মধ্যে স্বরবর্ণ হল সুস্বর, ব্যঞ্জনবর্ণ হল স্বরবর্ণ আরম্ভ বা শেষ করবার একটা উপায় মাত্র। টেবিলের উপর টক্‌টক্ করে শব্দ হল, বইখানা ধপ্ করে পড়ে গেল, হাতের তালিতে চট্‌পট করে, আর জলের উপর ছপ্‌ছপ করে আওয়াজ হল – এসব সুস্বর নয়।

মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা যে ঠং ঠং করে বাজল, তার ঠং এর ঠ-টা আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, সানুনাসিক অং-টা অনেকক্ষণ ধরে চলে, আর সেটা কর্কশ নয়।

কালোয়াতেরা গানের একটা শব্দ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সুরের কায়দা দেখান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই সুর-ভাঁজার কাজ চলে অ, আ, ই, উ, ও এই রকমের এক একটা স্বরবর্ণ নিয়ে।

ফনোগ্রাফ

কিছু দিন আগেকার কথা। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের একটি ছেলে টেলিগ্রাফের কাজ ভাল করে শিখবে ঠিক করল। দিনের বেলায় সামান্য মাহিনায় সে একটা টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করত। কিন্তু সে ভাবল রাতেও কাজ করতে না পারলে কাজটা সে ভালরকম আয়ত্ত করতে পারবে না, কারণ রাতে খবরের কাগজের জন্য যে সব খবর তাড়াতাড়ি আসে, সেগুলি ঠিকমতো ধরতে পারলে সে কাজে পাকা হবে, মাহিনা বাড়বে। সেখানে রাতে যে-লোকের উপর কাজের ভার ছিল সে সন্ধ্যার পর ঠিক ধাতস্থ থাকত না। সুতরাং বালকটি যখন তাকে সাহায্য করবার প্রস্তাব করল, সে ভদ্রলোকটি তো বেঁচে গেল।

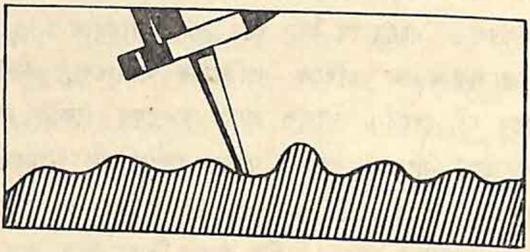
ছেলেটি তার সমবয়সী আর একজন উৎসাহী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাজে লেগে গেল। দুজনে মিলে মিশে কাজ চালিয়ে নিতে লাগল। কিছু দিন পরে এক বিপদ দেখা দিল। ও দিক থেকে যে টেলিগ্রাফ পাঠাত, সে চলে গেল। তার বদলে যে লোক এল সে এত তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠায় যে, ছেলেটি আর তার সঙ্গী দুজনে মিলেও তাল রাখতে পারে না।

ছেলেটি এক মতলব ঠাওরাল। সে দুটো পুরান মর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্র যোগাড় করল। মর্সের যন্ত্র হল দূরে এক জায়গায় আঙুলের চাপ দিয়ে টরে-টক্কা শব্দ করলে এদিকে, তড়িতের সাহায্যে, একটা লোহা টরে-টক্কা করে ঘা দেবে। বালক যন্ত্রে কাগজের একটা লম্বা ফিতা পরাল, আর যখন সংবাদ আসে তখন কাগজখানা টানতে থাকে। কাগজের উপর দাগ পড়ে যায়, ভিন্ন-ভিন্ন সংকেতে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের দাগ পড়ে। এই কাগজখানা এইবার দ্বিতীয় কলের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যায়, আর টরে-টক্কা শব্দ বেরতে থাকে। দ্বিতীয় কলে ইচ্ছামতো আস্তে আস্তে টানায় শব্দগুলি ধীরে ধীরে বেরয়, তাড়াতাড়ি আসায় ধরতে যে অসুবিধা হয় তা আর থাকে না। ছেলে দুটি এখন খুব খুশি। এখন কাজ বেশ চলেছে, তবে বাইরের কেউ জানে না কি করে কি হচ্ছে। দিনের বেলায় তারা ওই কল দুটি লুকিয়ে ফেলত। দাগওয়ালা কাগজ তারা মাঝে মাঝে ঝুলিয়ে রাখত, অনেকে সে দিকে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু কেউ বুঝত না কি করে কাগজে দাগ হয়েছে, আর ওই দাগগুলোর মানেই বা কি। যা হোক কাজ বেশ চলল।

একদিন ওই বালক ধরা পড়ে গেল। যুক্তরাজ্যে তখন সভাপতি নির্বাচনের সময়। খুব তাড়াতাড়ি চারদিক থেকে খবর আসছে, কিন্তু বালকদের ব্যবস্থায় সেগুলি প্রথমে কাগজে দাগ কাটবে, তারপর সেই দাগ থেকে শব্দ বের করতে হবে। এই করতে গিয়ে ওরা একটু পিছিয়ে পড়ল। খবরের কাগজওয়ালারা খুব হৈ চৈ আরম্ভ করল। কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানে জানতে পারলেন এতদিন কি করে কি হচ্ছিল। ওই কল দু'টির ব্যবহার বন্ধ করে দিলেন।

বালক কিন্তু ওই কল দু'টি রেখে দিল। সে ভাবতে থাকল, কথা থেকে দাগ কাটা, আর সেই দাগ-কাটা থেকে কথা বের করা, এ সম্ভব কি

না। সে একটা যেমন-তেমন ব্যবস্থা করে নিল,—একটা টান-টান চামড়ার গায়ে পিন লাগাল, পিনটা একখানা মোম-লাগান কাগজের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। সে চামড়ার সামনে 'হুঃ ক'রে একটা শব্দ করল, সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানাকে একটু টানল, কাগজখানায় একটা দাগ পড়ে গেল। এইবার বালক ওই দাগযুক্ত কাগজখানার দাগের গোড়ায় পিনটা বসিয়ে কাগজটা আবার টানল, আর কান পেতে রইল কিছু



চিত্র—21 উঁচু-নিচু দাগের উপর দিয়ে পিন চলেছে—ফলে পর্দা কাঁপছে

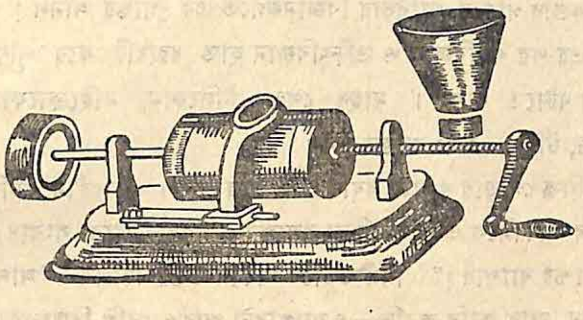
শোনা যায় কি না। বালক খুব মৃদু, বেশ স্পষ্ট, 'হুঃ'-শব্দ শুনতে পেল। 18 জুলাই, 1877 সাল। সেদিন ওই বালক এডিসন তার ডায়েরিতে লিখছে,—

একটা পর্দায় একটা পিন লাগান, আর পিনটা একখানা মোমমাখান কাগজে গিয়ে ঠেকেছে। পর্দার সামনে কথা বললুম, আর কাগজখানা সরাতে থাকলুম। পিন কাগজের উপর দাগ কেটে গেল। এখন আমার মনে হচ্ছে, এই রকম করে মানুষের গলার আওয়াজ ধরে রেখে দিতে পারব।

এডিসন যন্ত্রের উন্নতি করতে থাকলেন। একটা বোর্ড নিলেন, তাতে রাঙতা জড়ালেন, পিনটা রাঙতার গায়ে ঠেকল। পর্দার অপর দিকে একটা বড় চোঙা বসিয়ে কথা বলবার ব্যবস্থা করলেন, এতে করে পর্দার কাঁপুনি জোরাল হল। চোঙটা ঘুরতে থাকল। চোঙের সামনে এডিসন বললেন,—

Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow—

রাঙতার উপর দাগ হয়ে গেল। এইবার দাগের উপর পিন বসিয়ে চোঙা ঘুরালেন। কোন ভুল নেই, সেই শব্দ বেরতে লাগল—



চিত্র—22 এডিসনের তৈরী ফনোগ্রাফ

Mary had a little lamb,
Its fleeee was white as snow—

একেবারে স্পষ্ট। পৃথিবীতে ফনোগ্রাফের সৃষ্টি হল। যন্ত্রটা প্রথম কানের কাজ করে শব্দ ধরল, তারপর মুখের কাজ করে শব্দ বলল। এরপর এডিসন নানাভাবে ওই যন্ত্রের উন্নতি করতে থাকলেন। মোম খুব নরম, দাগ হবার পর তাকে শক্ত করবার ব্যবস্থা হল। তারপর যে-চোঙার উপর দাগ কাটা হবে, সেটা ঘুরবে আর সঙ্গে সঙ্গে এগোবে, সে উপায়ও করা হল।

এই এডিসনই ভবিষ্যতের জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানী আল্‌ভা এডিসন। বিজ্ঞানের যে-দিকটা তিনি ছুঁয়েছেন, সেই দিকটাই এগিয়ে দিয়ে গেছেন। এই এডিসনই বায়োস্কোপ আবিষ্কার করেন। ফনোগ্রাফ ও বায়োস্কোপের চেয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করতে বিজ্ঞানের বড় দান আর বোধ হয় বেশি কিছু নেই।

গ্রামোফোন

ফনোগ্রাফের পর এল গ্রামোফোন। মূল কথাটা একই রইল। ফনোগ্রাফে স্থচটি গর্ত গর্ত করে দাগ কেটে কেটে চলে, গ্রামোফোনে আড়াআড়ি ভাবে দাগ কাটে; আর গ্রামোফোনে চোঙের বদলে চাকতি

ব্যবহার করায় জায়গার সুবিধা হল, খরচ কম হল। তাছাড়া এর একটা ছাঁচ থেকে বহু শব্দলিপি ছাপা হতে পারে।

কলের গানের আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক যুগান্তর আনল!

এর পর শব্দবিজ্ঞান ও তড়িৎবিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে পৃথিবীতে অঘটন ঘটাতে থাকল। মানুষ পেল টেলিফোন, মাইক্রোফোন; পেল রেডিও, টকি। জগৎ স্তম্ভিত হল!

কিন্তু গোড়ার কথাটা সবার উপর রয়ে গেল। তারহীন টেলিগ্রাফের প্রবর্তক মার্কনিকে একজন মহিলা বললেন—"বিনা তারে সংবাদ পাঠান, কি আশ্চর্য ব্যাপার!" বিনীতভাবে মার্কনি উত্তর দিলেন—"আপনি কথা বলছেন, আর আমি শুনছি—এ ব্যাপারটা আরও বেশি বিস্ময়কর!"

পদার্থবিদ্যা : প্রথম খণ্ড (৮)

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা